দারসে হাদীস

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা হামিদা পারভীন

দারসে হাদীস

[তৃতীয় খণ্ড]

মাওলানা হামিদা পারভীন
কামিল হাদীস, কামিল তাফসীর, এম.এ
মুহাদ্দিস
মদীনাতুল উলূম মডেল ইনস্টিটিউট মহিলা কামিল মাদরাসা
তেজগাঁও, ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক
এম.এম, এম.এ
অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-বাইতুল মা'মূর
সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.amarboi.org

দারসে হাদীস-৩

মাওলানা হামিদা পারভীন

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭

পরিবেশনায় :
মক্কা পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৭১২৫৬৬০

রেক্স পাবলিকেশন্স
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। ফোন : ৮৬২২১৯৫

ISBN : 984-32-3627-0 Set

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৪
চৈত্র, ১৪২০
জমা. সানি, ১৪৩৫

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
ঢাকা-১২০৫।

বিনিময় ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

Darse Hadith-3 by Moulana Hamida Parvin Published by Ahsan Publication 191 Moghbazar (Wireless Railgate) Dhaka, First Edition April 2014, Price : Tk. 140.00 ($=4.00) only.

AP-75

www.amarboi.org

সূচীপত্র

- দারস-১ : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ॥ ৫
- দারস-২ : আনুগত্য ॥ ১৯
- দারস-৩ : অপরকে ক্ষমা করা ॥ ২৯
- দারস-৪ : ইসলামে বিচার ব্যবস্থা ॥ ৩৮
- দারস-৫ : হিজাব বা পর্দা ॥ ৫০
- দারস-৬ : স্বামীর অধিকার ॥ ৬৪
- দারস-৭ : স্ত্রীর অধিকার ॥ ৭৭
- দারস-৮ : মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ॥ ৮৬
- দারস-৯ : সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ॥ ৯৬
- দারস-১০ : শ্রমিকের অধিকার ॥ ১০৮
- দারস-১১ : আল্লাহর শোকর আদায় ॥ ১২০
- দারস-১২ : আখিরাতের প্রস্তুতি ॥ ১৩৩
- দারস-১৩ : জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি ॥ ১৪৩
- দারস-১৪ : জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি ॥ ১৫২
- দারস-১৫ : কবীরা গুনাহ্ ॥ ১৫৮
- দারস-১৬ : তাওবা ॥ ১৬৮
- দারস-১৭ : ক্ষমা প্রার্থনা ॥ ১৭৯
- দারস-১৮ : ইহ্তিসাব ॥ ১৮৯

www.amarboi.org

দারস-১

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ.(متفق عليه)

অর্থ ঃ হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ এক মু'মিনের সঙ্গে আরেক মু'মিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। একথা বলে উপমাস্বরূপ তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى ঃ হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। قَالَ (صلعم) عَنِ النَّبِىِّ ঃ নবী করিম (সা) বলেছেন। لِلْمُؤْمِنِ ঃ মু'মিনের জন্য। اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ঃ এক মু'মিনের সঙ্গে আরেক মু'মিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত। يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ঃ যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। ثُمَّ ঃ অতঃপর। بَيْنَ شَبَّكَ اَصَابِعِهٖ ঃ তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বের সকল মানুষই আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)-এর বংশধর। এ হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। কিন্তু প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে তা, যা দীনি সম্পর্কের কারণে গড়ে উঠে। ইসলামী আদর্শ, ধর্মীয় অনুভূতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে পারস্পরিক সহমর্মিতার প্রতি অনুপ্রাণিত করে থাকে। এই ভ্রাতৃত্বের ফলেই বিশ্বের মুসলমান একে অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করে থাকে। এই বন্ধনের সাহায্যেই বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক ও অভিন্ন। ইসলামী

www.amarboi.org

ভ্রাতৃত্ব এমনই এক সঞ্জীবনী ও সম্মোহনী শক্তি যা মানুষের পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং চরম শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে সহোদরের ন্যায় আপন করে নেয়। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবতার বন্ধু ছিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে তিনি যে অটুট ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। মু'মিনদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উপমা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى.

"পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে তুমি মু'মিনদেরকে দেখতে পাবে একটি দেহের মত। যখন দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন গোটা দেহ (তা অনুভব করে) বিনিদ্র (রজনী কাটায়) ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

অপর একটি হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ.

"সকল মু'মিন এক ব্যক্তির মত, যখন তার চোখ অসুস্থ হয় তখন তার সারা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তখন তার সর্বাঙ্গ ব্যথা অনুভব করে।" (মুসলিম)

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসার ফযীলত সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ بَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا اِنْ يَّتَفَرَّقَا.

www.amarboi.org

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং পরস্পর মুসাফাহা করে, তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের যাবতীয় দোষক্রটি মার্জনা করে দেয়া হয়। (আহমদ ও তিরমিযী)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

সহীহ আল-বুখারী

হাদীস বিশারদগণ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহ 'মুসনাদ' আকারে লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ যাচাই-বাছাই করে (সহীহ) বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ লিখার কাজে হাত দেন। এর ফলশ্রুতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ও শেষার্ধে বিশ্ব বিখ্যাত 'সিহাহ সিত্তা' বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ জগতবাসীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধতম অমর হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে 'সহীহুল বুখারী'।

ইমাম বুখারী (র) এ গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পূর্ণ নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ আল-যু'ফী আল-বুখারী। তিনি ১৯৪ হিজরী ১৩ শাওয়াল বুখারা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পবিত্র কুরআনকে মুখস্থ করেন। তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ 'তিন লক্ষ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল।' তাছাড়া তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে ১৬ বছরে এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। যার মধ্যে ৭,৩৯৭ তাকরারসহ ও তাকরার ছাড়া ২,৫১৩টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

হাদীস সংকলনের পূর্বে ইমাম বুখারী (র) গোসল করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে ইসতিখারা করার পর এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। সকল মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে, সকল হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরীফের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তাই বলা হয় ঃ

www.amarboi.org

اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيْحُ الْبُخَارِى.

"আল্লাহর কিতাবের পর আসমানের নিচে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল বুখারী।" (মুকাদ্দামা ফতহুল বারী ওয়া উমদাতুল কারী)

ইমাম বুখারী (র) সহজ-সরল, বিনয়ী, দয়ালু উন্নত চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি জীবনে কোন দিন কারো কোন গীবত করিনি।" এই মহা মনীষী ২৫৬ হিজরী ১ শাওয়াল ঈদুল ফিতর ভোর রাতে ইন্‌তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)।

সহীহ মুসলিম

এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম মুসলিম (র)। যার পূর্ণ নাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুরে ২০৪ হিজরী ২৪ রজব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ২১৮ হিজরীতে ১৪ বছর বয়সে হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি হিজাজ, ইরাক, মিশর, বাগদাদ, সিরিয়া ইত্যাদি মুসলিম জাহানের ইল্‌ম শিক্ষার কেন্দ্রভূমিসমূহে ভ্রমণ করেন। তিনি সে কালের জ্ঞানসাগর ও যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি ওস্তাদগণের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে দীর্ঘ ১৫ বছর সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে এ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। (তাহযীবুল আসমা ১০ম খণ্ড)

এতে তাকরার (পুনরাবৃত্তি)সহ হাদীস সংখ্যা ১২,০০০। তাকরার বাদে হাদীস সংখ্যা ৪,০০০ মাত্র। (তাদরীবুর রাবী)

সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থকে বিশুদ্ধ ও অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। আজ প্রায় বার শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সহীহ্ মুসলিমের সমমানের কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। হাফেয মুসলিম ইবনে কুরতুবী (র) বলেন ঃ

لَمْ يَضَعْ اَحَدٌ فِى الْاِسْلَامِ مِثْلَهُ.

www.amarboi.org

"ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ অন্য কেউই রচনা করতে পারেনি।" (মুকাদ্দামা, ফাতহুল বারী ঃ ২য় অধ্যায়)

এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম নিজেই মন্তব্য করেন ঃ "মুহাদ্দিসগণ যদি দু'শ বছর পর্যন্তও হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও তাদেরকে এ সনদযুক্ত বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।" (আল-মুকাদ্দামা আলাল মুসলিম, নবুবী)

ইন্তিকাল ঃ এই মহা-মনীষী ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকার্ল করেন। (আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দীসুন ঃ ৩৫৭ পৃঃ)

রাবী পরিচিতি ঃ আবু মূসা আশ'আরী (রা) নাম-আবদুল্লাহ, উপনাম-আবু মূসা। এ নামে তিনি অত্যধিক পরিচিত। পিতার নাম-কায়েস, মাতার নাম- তাইয়্যেবা। তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তথাকার 'আল-আশ'আর' গোত্রের সন্তান হওয়ায় তিনি 'আল-আশ'আরী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আবু মূসা ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। মক্কার 'আবদু শামস' গোত্রের সাথে বন্ধু সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর স্বদেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামন ফিরে যান।

হযরত আবু মূসা ছিলেন তাঁর খান্দানের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। খান্দানের লোকেরা খুব দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলমানের একটি দলকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার জন্য ইয়ামন থেকে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজাযের পরিবর্তে হাবশায় ঠেলে নিয়ে যায়। এদিকে হযরত জাফর বিন আবী তালিব ও তাঁর সংগী সাথীরা যাঁরা তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন, মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। আবু মূসা তাঁর দলটিসহ এই কাফিলার সাথে মদীনার পথ ধরলেন। তাঁরা মদীনায় পৌছলেন, আর এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী

www.amarboi.org

খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরেন। রাসূল (সা) আবু মূসা ও তাঁর সংগী সকলকে খাইবারের গনীমতের অংশ দান করেন। (আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭)

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ হযরত আবু মূসা মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হুনাইনের ময়দান থেকে পালিয়ে বনু হাওযাযিন 'আওতাস' উপত্যকায় সমবেত হয়। রাসূল (সা) তাদেরকে সমূলে উৎখাতের জন্য হযরত আবু আমেরের নেতৃত্বে একটি দল পাঠান। তারা আওতাস পৌঁছে হাওয়াযিন সরদার দুরাইদ ইবনুস সাম্মাকে হত্যা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে হাশামী নামক এক মুশরিকের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত আবু আমের মারাত্মকভাবে আহত হন। আবু মূসা আশ'আরী পিছু ধাওয়া করে এই মুশরিককে হত্যা করেন।

হিজরী নবম সনে আবু মূসা আশ'আরী তাঁর সংগী সাথীদেরকে নিয়ে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাবুক থেকে ফেরার পর একদিন আশ'আরী গোত্রের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে যে কোন একটি পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলো। তখন রাসূল (সা) মিসওয়াক করছিলেন। তাদের কথা শুনে তাঁর মিসওয়াক করা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবু মূসার দিকে ফিরে বললেন ঃ 'আবু মূসা, আবু মূসা!' আবু মূসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাদের অন্তরের কথা জানতাম না। আমি জানতাম না এভাবে তারা কোন পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে।" রাসূল (সা) বললেন ঃ যদি কেউ নিজেই কোন পদের আকাঙ্ক্ষী হয়, আমি কক্ষনো তাকে সেই পদে নিয়োগ করবো না। তবে, আবু মূসা তুমি ইয়ামন যাও। আমি তোমাকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করলাম।

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা শুরু হলে আবু মূসা (রা) জিহাদে শরীক হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ওয়ালীর দায়িত্ব ত্যাগ করে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। হিজরী ১৭ সনে সেনাপতি সা'দের নির্দেশে তিনি

www.amarboi.org

'নাসিবীন' জয় করেন। এ বছরই বসরার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বাকে (রা) অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু মূসাকে (রা) নিয়োগ করা হয়।

বসরার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা খুযিস্তান 'জুনদিসাবুর' 'নিহাওয়ান্দে'রের অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ২৩ সনে ইস্পাহান অভিযান চালিয়ে এ অঞ্চলটি ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ রাসূল (সা) তাঁকে ১০ হিজরীতে আদনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। প্রাচীনকাল থেকেই ইয়ামন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ 'ইয়ামন আকসা' ও 'ইয়ামন আদনা'। নিজ দেশ হওয়ার কারণে ইয়ামনবাসীর উপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর যথেষ্ট প্রভাব পূর্ব থেকেই ছিল। তাই সুষ্ঠুভাবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমারের (রা) শাসনামলে তিনি বসরা ও কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

স্বভাব চরিত্র ঃ তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাই রাসূল (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ 'হে আবু মূসা, তোমাকে দাঊদ (আ)-এর পরিবারের সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।' (বুখারী)

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি اَلْمُقِلُّوْنَ তথা তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ৫০টি হাদীস مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর ৪৫টি ইমাম বুখারী এবং ২৬টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।

ইন্‌তিকাল ঃ আল্লামা আইনীর মতে, ৫৪ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে কূফায় তিনি ইন্‌তিকাল করেন। মিশকাতের আসমাউর রিজালের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫২ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ উখওয়াত (اُخُوَّةٌ) আরবী শব্দ। এর অর্থ ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক। উখুওওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব দু'প্রকার। যথা ঃ

(ক) বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও (খ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

www.amarboi.org

(ক) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ঃ মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। পৃথিবীর আদি মানব আদম (আ) ও হাওয়া (আ) থেকে সকলের উৎপত্তি। তাই পৃথিবীর সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই। আর মানবতার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব জোড়া ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করা।

(খ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে একটি আদর্শিক সম্পর্ক। এক আল্লাহ তথা তাওহীদে বিশ্বাসী মু'মিন মাত্রই একে অপরের ভাই। এতে ভাষা, গোত্র, বর্ণ, বংশ বা অঞ্চলের কোন ভেদাভেদ নেই। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا.

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করতে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই কল্যাণে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ.

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তা কখনো ছিন্ন করা যায় না। এ জন্যই এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিন পর্যন্ত কথাবার্তা না বলা, সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ

www.amarboi.org

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَال.

"কোন মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা হালাল নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّار.

"কোন মুসলিমের জন্য তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলো এবং মারা গেল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফলাফল

১. **ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ঃ** ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মহান আল্লাহর তাওহীদ ও মহানবী (সা)-এর রিসালাত প্রতিষ্ঠা করে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا.

"তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

২. **ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ঐক্য গড়ে তোলে ঃ** ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের মধ্যে ইস্পাত-কঠিন ঐক্য গড়ে তোলে। যার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে।" (সূরা আস-সফ ঃ ৪)

৩. **ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্বার্থপরতা দূর করে ঃ** কৃত্রিম, মিথ্যা ও স্বার্থপরতার ঐক্য কখনো কোন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্বের ভিতকে ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ওপর স্থাপন করে এবং স্বার্থপরতা দূর করে।

www.amarboi.org

৪. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সম্পর্ককে অটুট রাখে ঃ ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে পারস্পরিক যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা ঠুনকো বা ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং তা হয় সীসাঢালা প্রাচীরের মত সুদৃঢ়। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

"তারা যেন সীসাঢালা প্রাচীর। " (সূরা আস-সফ ঃ ৪)

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا.

"একজন মু'মিনের সঙ্গে আরেক মু'মিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পরস্পরের জন্য উৎসর্গিত ঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তিই পস্পরের জন্য উৎসর্গিত ও নিবেদিত প্রাণ।

নিজের চেয়ে এরা অপর ভাইকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

"আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত।" (সূরা হাশর ঃ ৯)

ইসলামের অনুসারীগণ পরস্পর রহম দিল; যদিও তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

"তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং তাদের পরস্পরের সাথে সহানুভূতিশীল।" (সূরা আল-ফাতাহ ঃ ২৯)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী

১. সম্প্রীতি স্থাপন ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে হবে মজবুত সীসাঢালা প্রাচীরের মত। আপন ভাইদের মধ্যে যেমন অনুপম সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বিরাজ করে অনুরূপভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও হতে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ়। পার্থিব কোন স্বার্থ যেন এ সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতম চিড় বা ফাটল ধরাতে না পারে সেটাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী। মানবীয়

www.amarboi.org

দুর্বলতার সুযোগে কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে কলহ-কোন্দলের সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে ফেলতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ.

"তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যকার বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে আপোষ মীমাংসা করে দাও।" (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১০)

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّـنَّ اَكْـذَبُ الْحَدِيْـثِ، وَلاَتَحَسَّسُوْا وَ لاَتَجَسَّسُـوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

"তোমরা খারাপ ধারণা করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, খারাপ ধারণাপ্রসূত কথা নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার। তোমরা অপরের দোষ খুঁজবে না। কারো ক্ষতির উদ্দেশ্যে গোপন খবর বের করার চেষ্টা করবে না। ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেবে না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না, (অসৎ উদ্দেশ্যে) কেউ কারো পেছনে লেগে থাকবে না। বরং পরস্পর আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

২. পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ঃ মুসলমানদের মধ্যে যে কোন মূল্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ঐক্যকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম দাবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে জোরালোভাবে এই নির্দেশই দিয়েছেন।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا.

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

৩. নিরাপত্তা বিধান করা ঃ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অপর একটি মৌলিক দাবী। কেউ কাউকে কথা, কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যথিত করবে না। সর্বাবস্থায় সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে। রাসূল (সা)-এর বাণী ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

www.amarboi.org

"প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهٗ وَلاَيَخْذُلُهٗ وَلاَيَحْقِرُهٗ.

"একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর যুল্‌ম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهٗ وَمَالُهٗ وَدَمُهٗ.

"প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের ওপর হারাম।" (তিরমিযী)

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ.

"মুসলিম ভাইকে গালি দেয়া ফাসেকি, তার সাথে মারামারি করা কুফরি।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪. বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা ঃ মু'মিনগণ একে অপরের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এটাই ঈমানের দাবী। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهٗ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهٗ اِذَ مَاتَ وَيُجِيْبُهٗ اِذَا دَعَاهٗ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهٗ وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهٗ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ.

এক মু'মিনের জন্য অপর মু'মিনের ছয়টি অধিকার আছে। যথা ঃ

১. যখন সে অসুস্থ হবে তখন তার সেবা-শুশ্রুষা করবে;

২. মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফন ও জানাযায় শরীক হবে;

৩. কোন প্রয়োজনে বা বিপদে সাহায্যের আহ্বান জানালে তার আহ্বানে সাড়া দেবে;

www.amarboi.org

৪. সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করবে;

اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا.

"যখন তোমাদের সম্ভাষণ জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম পন্থায় অথবা তার সমপর্যায়ের সম্ভাষণ জানাবে।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৬)

৫. হাঁচি দিলে জবাব দেবে;

৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে। (নাসাঈ)

এক মুসলমান অপর মুসলমানের বিপদে-আপদে যদি এগিয়ে না আসে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে আনন্দিত হয় তবে ঐ ধরনের বিপদে সেও পতিত হবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ يَبْتَلِيْكَ.

"তোমাদের ভাইদের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে অনুরূপ বিপদে ফেলবেন। (তিরমিযী)

৫. নিজের জন্য যা পছন্দনীয় অপরের জন্যও তা পছন্দ করা ঃ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী হচ্ছে, এক ভাই তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা সে অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। আর যা নিজের জন্য অপছন্দ করবে তা তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও অপছন্দ করবে। কখনো আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থান্ধ হবে না। বরং অপরের প্রয়োজন ও পছন্দকে নিজের প্রয়োজন ও পছন্দের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَاتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.

"তুমি অন্য মানুষের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করবে, আর তাদের জন্য তা অপছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য অপছন্দ করবে।" (আহমদ)

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ مَايَكْرَهُ لِنَفْسِهِ.

www.amarboi.org

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা কিছু পছন্দ করে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করে। আর অপরের জন্য তাই অপছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে সামগ্রিক ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও অনুপম ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছে, যা তাদেরকে এক অভিন্ন জাতি সত্তায় পরিণত করেছে। মানবাত্মার সাথে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য, ইসলামে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কও তেমনই অবিচ্ছেদ্য। ইসলাম মানুষকে সে অনুপম ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দান করে, যা আনসার ও মুহাজিরদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। মানবেতিহাসের কোথাও যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদেরকে সে নীতি অনুসরণ করতে হবে।

বস্তুতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কল্যাণে মুসলিমগণ পারস্পরিক দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে একাত্ম হয়ে সুখের নীড় রচনা করবে, অপরের জীবন সম্পদ ও সম্মান-সম্ভ্রমের হেফাযত করবে। এসব কিছুকে তার জন্য পবিত্র আমানতরূপে গণ্য করবে। একে অপরকে সকল প্রকার অনিষ্ট-অকল্যাণ হতে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ইস্পাত কঠিন ঐক্য রচনা করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর মুসলিম জাতি সত্তার দুশমনদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর ঐক্য গড়ে তুলবে এটাই হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দাবী।

শিক্ষা

১. একজন মু'মিনের সঙ্গে আরেক মু'মিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত। যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত।

২. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরও পারস্পরিক সম্পর্ক সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত হতে হবে। কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণেও তাঁর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

৩. জাতীয় ঐক্যকে মজবুতভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-২

আনুগত্য

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. (بخارى و مسلم)

১৩. **অর্থ** ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "নেতা যে পর্যন্ত কোন পাপকার্যের আদেশ না করবে সে পর্যন্ত তার আদেশ শোনা ও মেনে নেয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক। হ্যাঁ যদি কোন পাপকার্যের আদেশ করা হয় তাহলে তা শোনা ও মানা যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ اَلْمَرْءُ الْمُسْلِمِ ঃ মুসলিম ব্যক্তি। اَلسَّمْعُ ঃ শোনা। اَلطَّاعَةُ ঃ আনুগত্য করা। اَحَبَّ ঃ পছন্দ করা। كَرِهَ ঃ অপছন্দ। يُؤْمَرُ ঃ আদেশ করা হয়। مَعْصِيَةٌ ঃ পাপ কাজ।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান তথা ইসলামী আন্দোলনের নেতার কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয। এ আনুগত্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আনুগত্য করা না করা কোন ব্যক্তির পছন্দ এবং অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থাকতেই পারে। কিন্তু আনুগত্যের ব্যাপারে একে প্রাধান্য দেয়া যাবে না বরং সকল ক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য করে যাওয়াই কর্তব্য। হ্যাঁ নেতার কোন আদেশ যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত হয়, যা ঈমানের দাবীর পরিপন্থী এবং না-ফরমানীর পর্যায় পড়ে, সে ধরনের আদেশের আনুগত্য করা যাবে না। আর কোন মুসলিম নেতা এমন আনুগত্য পাওয়ার দাবীও করতে পারেন না।

www.amarboi.org

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ বুখারী ও মুসলিম।

এ দুটি হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)।

নাম ঃ আবদুল্লাহ। উপনাম ঃ আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম ঃ উমার বিন খাত্তাব। মাতার নাম ঃ যয়নব বিন্তে মায্উন। জন্ম ঃ নবুওতের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে নবুওতের ১৩তম বছরে মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৪র্থ খণ্ড)

খন্দকের যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন ও বিদায় হজ্জে রাসূলের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রাসূল (সা)-এর দরবারে ছোট সাহাবী ছিলেন। রাসূলের সান্নিধ্যে বেশী সময় থাকার সুযোগ পাওয়ায় তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছেন। ইল্মে ফিকহে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। জনসাধারণ তাঁর ইল্মে ফিকহের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হয়েছেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ "হযরত আবু হুরায়রার (রা) পরে সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী"। (উমদাতুল কারী শরহে বুখারী ১ম খণ্ড ১১২ পৃঃ)

বর্ণিত হাদীস সংখ্যা

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০। তার মধ্যে ১৭৩টি বুখারী ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত বুখারী শরীফে ৮১টি ও মুসলিম শরীফে ৩১টি হাদীস এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (উমদাতুল কারী শরহে বুখারী ১ম খণ্ড ১১২ পৃঃ)

www.amarboi.org

ইনতিকাল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) জনসাধারণের সুপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ কারণে হাজ্জাজ তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করত। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের শাসনামলে হজ্জ থেকে ফেরার পথে হাজ্জাজের পরামর্শে তার জনৈক সিপাহী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমারের পায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিলে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণজনিত কারণে হিজরী ৭৩/৭৪ সালে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইনতেকাল করেন। (উসদুল গাবা)

নেতার আনুগত্য

ইতা'আত (اِطَاعَةٌ) আরবী শব্দ। অভিধানে এর অর্থ ঃ আনুগত্য করা, মান্য করা, বাধ্যতা স্বীকার করা, মেনে চলা ইত্যাদি।

আল কুরআনে তা'আত (طَاعَـةٌ) শব্দটি ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ইতা'আত (اِطَاعَةٌ) শব্দটি ৭৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নেতার আনুগত্য করা ফরয। নেতার আনুগত্য ছাড়া জামায়াতী যেন্দেগীর সুফল লাভ করা যায় না। সর্বাবস্থায় নেতার আনুগত্য করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতার আনুগত্য কর।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩২)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

www.amarboi.org

আর যে মুখ ফিরিয়ে নিলো, আমি তো আপনাকে তাদের ওপর পাহারাদার করে পাঠাইনি।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৮০)

নেতার আদেশ মন দিয়ে শোনা ঃ আনুগত্যের জন্য শর্ত হচ্ছে নেতার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শোনার তাকিদ করা হয়েছে। নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে না শোনলে তার আনুগত্য করা যায় না। নবী করীম (সা) যখন কোন আলোচনা করতেন তখন ইয়াহুদীরা শোনার সময় না বোঝার ভান করে নবীজিকে লক্ষ্য করে বলে উঠত رَاعِنَا, অর্থাৎ আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা (রাসূলকে সম্বোধন করে) "রায়িনা" বলো না। তোমরা বরং 'উনযুরনা' বলো এবং (তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে) শোন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০৪)

ন্যায় কাজের আনুগত্য করবে ঃ ন্যায় কাজের আনুগত্য করতে হবে অন্যায় ও পাপকার্যে আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্যের জন্য এটাই হলো শর্ত। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) لاَطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَّةٍ اِنَّمَاالطَّاعَةُ فِىْ الْمَعْرُوْفِ. (بخارى و مسلم)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পাপকার্যে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু ভাল কাজের ব্যাপারে। (বুখারী ও মুসলিম)

নেতার আনুগত্য মানে রাসূলের আনুগত্য ঃ যেহেতু রাসূল আমাদের মাঝে বর্তমান নেই; সেহেতু নেতার আনুগত্য করলে রাসূলেরই আনুগত্য করা হবে। আর রাসূলের আনুগত্য করা হলে প্রকারান্তরে আল্লাহরই আনুগত্য করা হবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهَ مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ. (بخارى، مسلم)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল।" (বুখারী, মুসলিম)

নেতার খারাপ কাজের সমর্থন করবে না ঃ নেতার অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না। ন্যায় কাজের আনুগত্য করতে হবে; অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِىَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهٖ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَمَاصَلُّوْا. (مسلم)

হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের ওপর এমন সব লোক শাসক হবে, যারা ভাল কাজও করবে খারাপ কাজও করবে। সুতরাং যে তাদের খারাপ কাজের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলো। আর যে মনে মনে উক্ত কাজকে অপছন্দ করলো সেও নিরাপদ (অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে গেলো)। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তার অনুসরণ করলো সে পাকড়াও হবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না ? রাসূল (সা) বললেন ঃ না, যে পর্যন্ত তারা নামায আদায় করতে থাকবে (সে পর্যন্ত তা করবে না)। (মুসলিম)

www.amarboi.org

আনুগত্য না করার পরিণতি ঃ নেতার আনুগত্য করা ফরয। যে তা প্রত্যাহার করে নেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সে কোন জবাব দিতে পারবে না এবং তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ.

"শয়তান তার বন্ধুদের প্ররোচনা দেয় তোমাদের সাথে বিবাদ করতে, যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে অবশ্যই হয়ে পড়বে মুশরিক।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

যখন মু'মিনদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের আহ্বান করা হয় তখন তারা বলেন ঃ আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাইতো সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর

www.amarboi.org

রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরাগভাজন হওয়া থেকে সতর্ক থাকে তারাই কামিয়াব।" (সূরা আন-নূর ঃ ৫১-৫২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা পেশ করো আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ ও আখিরাতে।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

সুখে-দুঃখে নেতার আনুগত্য করা ঃ অপর এক হাদীসে সুখ-দুঃখের ও খুশি-অখুশির মুহূর্তেও নেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ও আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ. وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لاَّنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. (متفق عليه)

হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা) এর নিকট এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম যে, আমরা (নেতার আদেশ) শুনবো ও মানবো, তা দুঃখের সময় হোক আর সুখের সময় হোক। খুশির মুহূর্তে হোক আর অখুশির মুহূর্তে হোক এবং আমাদের ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিলেও। ছাহেবে আমরের (নেতার) সাথে আমরা বিতর্কে জড়াবো না। তবে হ্যাঁ যদি তোমরা তাকে প্রকাশ্যে

www.amarboi.org

কুফরি তথা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে দেখ এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন দলিল প্রমাণ থাকে তা হলে ভিন্ন কথা। আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন হক কথা বলবো। আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

আনুগত্যের শর্ত ঃ ন্যায় কাজের আনুগত্য করতে হবে অন্যায় ও পাপকাজে আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্যের জন্য এটাই হলো শর্ত।

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَّةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

"পাপকাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু ভাল কাজের ব্যাপারে"। (বুখারী ও মুসলিম)

নেতা হাবশী গোলাম হলেও আনুগত্য করবে ঃ নেতা হাবশী গোলাম হলেও আনুগত্য করতে হবে।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ (صلعـم) اِسْـمَعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَاسَهُ زَبِيْبَةٌ. (رواه البخارى)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদিও শুকনো আঙ্গুরের মত (ক্ষুদ্র) মাথাবিশিষ্ট কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয়। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ مَنْ اَهَـانَ السُّلْطَانَ اَهَانَهُ اللّٰهُ. (رواه الترمذى)

হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুনাইদা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালামা ইবনে ইয়াযিদ আল-জুফি (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের ওপর যদি এরূপ শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতাসীন হয়

www.amarboi.org

যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নেয়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না, তখন আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? রাসূল (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সালামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ, "তাদের (পাপের) বোঝা তাদের ওপর, তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর।" (মুসলিম)

যে সকল নেতার আনুগত্য করা যাবে না ঃ যেসব নেতৃত্ব মেনে নিলে এবং নেতা হিসেবে যাদের অনুসরণ করলে ঈমানের দাবী বৃথা হয়ে যায়; তাদের সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে সকল নেতার আনুগত্য করা যাবে না তাদের সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. কাফিরদের নেতৃত্ব ঃ কাফিরদের নেতৃত্ব মানা যাবে না এবং তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

فَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا.

"সুতরাং (হে নবী) আপনি কাফিরদের অনুসরণ করবেন না, আর এ কুরআনকে নিয়ে তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে জিহাদ করুন।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫২)

২. মুনাফিকদের নেতৃত্ব ঃ মুনাফিকদের নেতৃত্ব মানা যাবে না এবং তাদের অনুসরণও করা যাবে না।

وَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ.

"আপনি কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৮)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "মুনাফিকদেরকে কখনো নেতা বলে সম্বোধন করবে না। তুমি যদি তাদেরকে নেতা বল তাহলে আল্লাহ্ তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন।" (মিশকাত)

৩. মিথ্যাবাদীর নেতৃত্ব ঃ মিথ্যাবাদীদের নেতৃত্ব ও আনুগত্য করা যাবে না।

فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"অতএব যারা মিথ্যাবাদী আপনি তাদের অনুগত হবেন না।" (সূরা আল-কলম ঃ ৮)

www.amarboi.org

৪. আল্লাহর বিধান অমান্যকারীর নেতৃত্ব ঃ যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তাদের নেতৃত্ব মানা যাবে না।

وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا.

"যারা আল্লাহর বিধানকে মিথ্যা মনে করে আপনি তাদের ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করবেন না।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫০)

৫. চরিত্রহীন ও অসৎ নেতৃত্ব ঃ চরিত্রহীন ও অসৎ নেতৃত্বের আনুগত্য করা যাবে না।

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ. هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ.

"আপনি এমন ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না– (১) যে খুব বেশী কসম করে; (২) যে গুরুত্বহীন ব্যক্তি; (৩) যে লোকদেরকে সাক্ষাতে নিন্দা করে; (৪) পেছনে চোগলখুরী করে বেড়ায়; (৫) যে ভাল কাজের প্রতিবন্ধক; (৬) যে যুল্‌ম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত; (৭) যে বড়ই দুর্দম চরিত্রহীন এবং এ সবের সংগে সংগে অবৈধজাতও (জারজ)। (সূরা আল-কালাম ঃ ১০-১৩)

৬. বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব ঃ দুনিয়ায় যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে সে সকল সীমালংঘনকারীদের নেতৃত্ব মানা যাবে না।

وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَا الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَيُصْلِحُوْنَ.

"তোমরা সেসব নেতাদের অনুসরণ কর না, যারা লাগামহীন ও সীমালংঘনকারী, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কোনরূপ সংস্কার-সংশোধনমূলক কাজ করেনা।" (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৫১)

শিক্ষা

১. নেতার আদেশ শোনা ও মানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

২. শরীআতসম্মত আদেশের ক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য করতে হবে।

৩. চাই নেতার আদেশ পছন্দ হোক বা না হোক।

৪. নেতা পাপকার্যের আদেশ করলে সে ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না।

৫. আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-৩

অপরকে ক্ষমা করা

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ (صلعم) قَالَ اَقْبِلُوْا ذَوِى الْهَيْأَتَ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ. (ابو داود)

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎ স্বভাবসম্পন্ন সম্মানিত লোকদের দোষ-ত্রুটি হলে তা ক্ষমা করে দাও। কিন্তু হুদুদ অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নয়। (আবু দাউদ)

শব্দার্থ ঃ عَنْ عَائِشَةَ (رض) ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। قَالَتْ ঃ তিনি (আয়েশা রা.) বলেন। اِنَّ النَّبِىَّ (صلعم) قَالَ ঃ নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন। اَقْبِلُوْا ঃ ক্ষমা করে দাও। ذَوِى الْهَيْأَتَ। সৎ স্বভাবসম্পন্ন সম্মানিত লোক। عَثَرَاتِهِمْ। তাদের ত্রুটিসমূহ ঃ اِلاَّ الْحُدُوْدَ। কিন্তু হুদুদ অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নয়।

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ. (متفق عليه)

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যেন এখনো রাসূল (সা)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া কেরামদের (আ) কোন একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁর কাওম তাকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন, আর বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার কাওমকে ক্ষমা করে দিন। কারণ তারা জানে না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নবীর জীবন থেকে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করেন এবং তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। তিনি চান তাঁর বান্দাদের মধ্যে একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করুক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ.

"হে নবী (সা)! আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দিন।" (সূরা হিজর ঃ ৮৫)

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ.

"তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নূর ঃ ২২)

وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

"যে লোক ধৈর্যধারণ করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম। (সূরা আশ-শূরা ঃ ৪৩)

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আল্লাহ লোকদের ক্ষমাকারীগণ ও সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৪)

প্রত্যেক কাজে দয়াশীলতা দেখানো উচিত। আল্লাহ দয়াশীলতাকে পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ.

"আল্লাহ তা'আলা দয়াশীল। তিনি প্রত্যেক কাজে দয়াশীলতা পছন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ দয়াশীল। তিনি দয়াশীলতাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়াশীলতার দ্বারা সে বস্তু দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না এবং দয়াশীলতা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারাও তিনি তা দান করেন না।" (মুসলিম)

www.amarboi.org

কোন ভাল লোক অসাবধানতাবশতঃ কোন কাজে ভুল-ভ্রান্তি করে বসলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। ভবিষ্যতে যাতে সে সতর্ক হতে পারে এবং তার দ্বারা এ কাজ পুনরায় সংঘটিত না হয়, এ জন্য তাকে উপদেশ দেয়া প্রয়োজন। তবে তার দ্বারা হুদুদ সংক্রান্ত যেমন যেনা-ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হলে তা ক্ষমা করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে শরীআত অনুযায়ী তার বিচার হবে।

রাসূল (সা) কখনো কারো প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহর নির্ধারিত কোন হুকুমকে লংঘন করা হলে বিচারের ক্ষেত্রে তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহর পথে জিহাদ করতে যেয়ে ইসলামের দুশমনদের আঘাত করতে তিনি পিছপা হননি।

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল একটি নাজরানী চাদর। চাদরটির উভয় পাশ ছিল বেশ পুরো। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর গায়ের চাদরখানা ভীষণ জোরে টান দিল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার কারণে ঘাড়ে চাদরের পাড়ের দাগ লেগে রয়েছে। বেদুঈন লোকটি বললো ঃ হে মুহাম্মদ! (সা) তোমার কাছে আল্লাহর দেয়া যে ধন-সম্পদ রয়েছে তার থেকে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন। তারপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি এ গর্হিত কাজের কোন প্রতিশোধ নিলেন না এবং রাগান্বিত হলেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

ক্ষমা করে দেয়া ইসলামী নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলাম এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি রহম কর, তাহলে তোমাদের প্রতিও রহম করা হবে। অনুরূপভাবে তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাহলে তোমাদের অপরাধসমূহও ক্ষমা করে দেয়া হবে। তায়েফবাসীর

www.amarboi.org

নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য রাসূল (সা) হাজির হলে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এর পরেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর এ ক্ষমার কারণেই তাঁর প্রাণের দুশমনেরা প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হয়। আর এভাবেই ইসলামের প্রসার ও বিজয় সূচিত হয়।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ

সুনানে আবু দাউদ

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন জগত বিখ্যাত হাদীস বিশারদ সুলাইমান ইবনুল আশয়াছ ইবনে ইসহাক আল আসাদী আসসিজিস্তানী। কান্দাহার ও চিশত-এর নিকট সীস্তান নামক স্থানে তিনি ২০২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, সিরিয়া, মিশর, খোরাসান পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। হাদীসে তাঁর যে অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পারদর্শিতা ছিল, তা যুগের সকল মনীষীই উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির প্রশংসা করেছেন। সে সঙ্গে তাঁর গভীর তাকওয়া ও পরহেজগারীর কথাও সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইমাম হাফিজ আবু আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ "ইমাম আবু দাউদ নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।"

তিনি ২৭৫ হিজরীতে বসরা নগরীতে ইনতিকাল করেন। ইমাম আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তাঁর সুনানের জন্য নির্বাচিত করেন। তিনি শুধু মাত্র আহকাম সম্পর্কিত হাদীসই সংকলন করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে এমন সব হাদীসই গুরুত্বসহকারে সংকলন করেছেন যেসব হাদীস দ্বারা বিভিন্ন ফিক্হী আহকামের বুনিয়াদ রেখেছেন।

إِنَّهَا تَكْفِيْ الْمُجْتَهِدَ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.

"একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিক্হের মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন মজিদের পরে এই সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট।"

www.amarboi.org

সংকলন সমাপ্ত করার পর তিনি গ্রন্থটি তাঁর হাদীসের উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। ইমাম আহমদ এটিকে খুবই পছন্দ করেন এবং ইহা একখানা উত্তম হাদীস গ্রন্থ বলে প্রশংসা করেন।

অতঃপর তা সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। আর আল্লাহ উহাকে এত বেশী জনপ্রিয়তা ও জনগণের নিকট মর্যাদা দান করেছেন, যা সিহাহ সিত্তার মধ্যে অপর কোন গ্রন্থই লাভ করতে পারেনি।

রাবী পরিচিতি ঃ

নাম ঃ আয়েশা, উপনাম ঃ উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি ঃ সিদ্দীকা, সম্বোধন ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)।

তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বোনের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পরিচয়ে তাঁকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। রাসূল (সা) তাঁকে সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদিনী বলে ডাকতেন।

পিতার নাম ঃ আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, মাতার নাম ঃ উম্মে রুম্মান বিনতে আমের।

তিনি হিজরতের ৯ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয়া। তিনি ছিলেন ফিকাহবিদ, হাদীসবিদ, মুফাস্সির, ভাষাবিদ, বুদ্ধিমতি ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত। আরবদের অতীত কাহিনী এবং কাব্য সাহিত্যে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। রাসূল (সা) গৃহের অভ্যন্তরে যা কিছু করতেন সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার ওপর বেশী নির্ভর করা হয়। যখন সাহাবাগণ কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন না তখনই তারা আয়েশা (রা) এর নিকট জিজ্ঞেস করে তা সমাধান করে নিতেন। তাঁর থেকে আহকাম ও মাসায়েল, আখলাক, আদাব এবং সীরাতে নববী সম্পর্কে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাঁর ভাগিনা উরওয়া বিন যুবায়ের এবং ভাতিজা কাসিম বিন মুহাম্মদ তাঁর নিকট থেকে বেশী হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম মুস্তাদরাকে, তবাকাতে ইবনে সা'দ ও মুসনাদে ইবনে হাম্বল নামক

www.amarboi.org

গ্রন্থেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায়। ৫৭ হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকী'তে রাতের বেলা তাঁকে সমাহিত করা হয়। (আসমাউর রিজাল)

অপরকে ক্ষমা করা

'আফুউ' (اَلْعَفْـوُّ) আরবী শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্ষমা। ইসলামী পরিভাষায় প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ইসলামের নীতি অনুসারে ক্ষমা করে দেয়াকে আফুউ (اَلْعَفُوُّ) বলা হয়।

ক্ষমা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা প্রতাপশালী। এতদসত্ত্বেও বহু মানুষ তাকে এবং তার দেয়া বিধানকে কেবল অস্বীকার করে না বরং বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ রাসূল (সা)-কে ক্ষমার নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

"আপনি ক্ষমার নীতি অনুসরণ করুন, সৎ কাজের আদেশ দান করুন এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯)

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ.

"যারা আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করে না, তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। আর তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু অপরাধীকে ক্ষমা করে থাকেন অতএব এ গুণে গুণান্বিত হয়ে মানুষকেও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করা উচিত।

ক্ষমার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ঃ ক্ষমা একটি মহৎগুণ। মানব জীবনে ক্ষমার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ক্ষমাশীল। তিনি মানুষের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

www.amarboi.org

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

"তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।"

আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা অপরিসীম বলেই মানুষ গুনাহ করে সাথে সাথে তওবা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

তাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষকেও একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া কর্তব্য। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ.

"আর যদি তোমরা ক্ষমা কর, ভুলে যাও এবং মাফ করে দাও তবে আল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৪)

إِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ.

"আল্লাহ তা'আলা নিজেও মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-মুজ্জাম্মিল ঃ ২০)

ক্ষমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. ক্ষমায় মর্যাদা অর্জন হয় ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর এ ক্ষমাসুন্দর আচরণের কারণে অপরাধী ব্যক্তির অন্তরে তার জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ

وَلَاعَفَ رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।" (মুসলিম)

হযরত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

يَا رَبِّى مَنْ اَعَزُّ عِبَادَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

www.amarboi.org

“হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত? আল্লাহ বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।” (বায়হাকী)

২. তাকওয়া লাভ করা যায় ঃ অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করলে, তাকওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ এবং মর্যাদা প্রাপ্তি সহজ হয়।

وَاِنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

“আর যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা তাকওয়া বা খোদাভীতির নিকটবর্তী।”

৩. আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা যায় ঃ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা লাভ করা যায়।

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

“আর যদি তোমরা ক্ষমা কর, ভুলে যাও এবং মাফ করে দাও তবে আল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ও করুণাময়।” (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৪)

৪. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় ঃ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমার মাধ্যমে ক্ষমাশীল ব্যক্তি পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে সর্বোত্তম চরিত্র লাভ করতে পারে।

اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ اَخْلاَقِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

“আমি কি তোমাকে ইহজগত ও পরকালবাসীদের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রে কথা বলব না? তিনি বললেন ঃ যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর এবং যে তোমার উপর অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।” (বায়হাকী)

৫. পুরস্কার লাভ করা যায় ঃ মহান আল্লাহ স্বয়ং ক্ষমাশীল। ক্ষমার ন্যায় মহৎ গুণে আল্লাহ তার বান্দাদের গুণান্বিত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মহান গুণে গুণান্বিত হবেন সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে পুরস্কার ও ভালবাসা লাভ করবেন।

www.amarboi.org

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আর যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে এরূপ নেক বান্দাদের আল্লাহ ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

৬. আল্লাহর বিধান মান্য করা ঃ ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। মানব জীবনে মহান আল্লাহর নির্দেশ মান্য করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ.

"আপনি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯)

মক্কা বিজয়ের পর যখন মুসলিম বাহিনী বিজয়ের বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং কাফির ও মুশরিকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগলো, তখন মহানবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.

"আজ তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়া হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘোষণায় পলায়নরত ভীত-সন্ত্রস্ত মক্কাবাসীর মনে ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে প্রবল শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছিল যা পরবর্তী সময় ইসলাম গ্রহণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

শিক্ষা

১. মানুষের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া কর্তব্য।

২. কিন্তু হুদুদ সংক্রান্ত অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ক্ষমা করা যাবে না।

৩. নবীগণ আঘাত প্রাপ্ত ও রক্তাক্ত হয়েও ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।

৪. নবীগণ আল্লাহর নিকট কাওমকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছেন।

৫. আমাদের উচিত মানুষের অপরাধ ক্ষমা করা।

www.amarboi.org

দারস-৪

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ (صعلـم) يَـا اَبَـا هُرَيْرَةَ، عَدْلُ سَاعَةٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً، قِيَـامِ لَيْلِـهَا وَصِيَامِ نَهَارِهَا، وَيَا اَبَـا هُرَيْـرَةَ، جَـوْرُ سَـاعَةٍ فِـىْ حُكْـمٍ اَشَـدُّ وَاَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَعَاصِيْ سِتِّيْنَ سَنَةً. (اصبحانى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আবু হুরায়রা, এক ঘণ্টার ন্যায়বিচার ষাট বছরের ইবাদত তথা রাতভর নামায পড়া ও দিনে রোযা রাখার চেয়ে উৎকৃষ্ট। হে আবু হুরায়রা, এক ঘণ্টার অত্যাচার আল্লাহর কাছে ষাট বছর ব্যাপী নাফরমানী করার চেয়েও মারাত্মক। (ইসবাহানী)

শব্দার্থ ঃ عَـنْ اَبِـىْ هُرَيْـرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। قَـالَ ঃ তিনি বলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ (صعلـم) ঃ রাসূল (সা) বলেছেন। يَـا اَبَـا هُرَيْـرَةَ ঃ হে আবু হুরায়রা। عَدْلُ سَاعَةٍ ঃ এক ঘণ্টার ন্যায় বিচার। اَفْضَـلُ ঃ অধিক উৎকৃষ্ট। مِنْ عِبَادَةِ ঃ ইবাদতের চেয়ে। سِـتِّيْنَ سَـنَةً ঃ ষাট বছর। قِيَامِ لَيْلِـهَا ঃ রাতভর নামায পড়া। وَصِيَامِ نَـهَارِهَا ঃ দিনে রোযা রাখার। جَوْرُ سَاعَةٍ ঃ এক ঘণ্টার অত্যাচার। فِىْ حُكْمٍ اَشَـدُّ ঃ অধিক মারাত্মক। وَاَعْظَـمُ ঃ অধিক বেশী। عِنْدَ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর কাছে। عَـزَّ وَجَـلَّ ঃ মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। مِنْ مَعَاصِيْ ঃ নাফরমানী করার চেয়েও। سِتِّيْنَ سَنَةً ঃ ষাট বছর।

www.amarboi.org

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ (صعلم) اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا: اِمَامٌ عَادِلٌ وَاَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ. (الترمذى)

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটতম ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নেতা, আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ক্রোধভাজন ও দূরতম ব্যক্তি হবে অত্যাচারী শাসক। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য পবিত্র হাদীসদ্বয় প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ইসবাহানী ও জামে আত-তিরমিযী থেকে চয়ন করা হয়েছে। হাদীসদ্বয়ে আদল তথা ন্যায় বিচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদলের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। কেননা, আদল বা ন্যায়বিচার ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়বিচার ও ইহসানের।" (সূরা আন-নাহল ঃ ৯০)

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ.

"এবং তোমাদের মধ্যে আদল তথা ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ১৫)

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا.

"তোমরা দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫)

হযরত বারীদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ

www.amarboi.org

করেছেন ঃ তিন শ্রেণীর বিচারক রয়েছে। তার মধ্যে শুধু এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অপর দু'শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে এমন ব্যক্তি যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদানুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানার পরেও ফায়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও যুল্‌ম করেছে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্য বিচার-ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের ওপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, "যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই"– এই মর্মে সাক্ষ্য দিলেও আল্লাহ তা গ্রহণ করেন না। এদের একজন হচ্ছে যালেম শাসক। (তাবারানী)

হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শুনে রাখ ওহে জনমণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'আলা কোন অত্যাচারীর নামায কবুল করেন না। (হাকেম)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ ইসবাহানী।

ইসবাহানী গ্রন্থের রচয়িতা আবু নু'য়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ। এ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম হি'লয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া। গ্রন্থকারের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আবু নু'য়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মিহরান আশ-শাফিঈ আল ইসবাহানী (র) ৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ৯৪৮ খৃঃ ইরানের ইসবাহান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ একজন সুবিখ্যাত ফিকাহ ও তাসাউফ বিশারদ ছিলেন।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য যে, তিনিই ছিলেন বংশের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। আবু নু'য়াইম আল-ইসবাহানীর পিতাও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রের ছয় বৎসর বয়স হতেই জাফর আল খুলদী ও আল আসামন এর ন্যায় সুবিখ্যাত উস্তাদগণের নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য অর্পণ করেন। হিজরী ৩৫৬ মোতাবেক ৯৬৭ সাল হতেই ইরাক হিজায ও খুরাসান-এ ভ্রমণ করে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দীর্ঘ ১৪ বৎসর যাবত তিনি শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাগণের অন্যতম বলে গণ্য হতেন। তার সমসাময়িক আল খতীব আল বাগদাদীও এই মত প্রকাশ করেন। ইমাম আয যাহাবী ও আস-সবুকীও (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। কথিত আছে তার নিকট হতে হাদীস সংগ্রহকারীগণের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- হি'লায়াতুল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আসফিয়া। এ গ্রন্থটিতে তিনি যথার্থ সুফীবাদকে তুলে ধরেছেন। সুফীবাদ বলে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

সুফীবাদ সম্বন্ধে সাধারণ বর্ণনার পরে তিনি সুফী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিভিন্নতার উল্লেখ করেন, সর্বোপরি 'সূফ' মূল ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দাবলী আলোচনা করেন। এতে প্রথম সারির সাহাবীদের চিন্তা-চেতনা হাদীসের আলোকে তুলে ধরেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বড় গ্রন্থ হলো- যিকরু আখবারি ইসবাহান। এ গ্রন্থটিতে তিনি ইসবাহানের পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের জীবনী এবং ইসবাহান শহরের ভূগোল ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এছাড়াও নবুয়তের প্রমাণ, রাসূল (সা)-এর চিকিৎসা ও ঔষধ সম্পর্কিত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের উদ্ধৃতি সমেত কয়েকখানি ছোট ছোট বই রচনা করেন। এমনকি তার লেখনীতে রাসূল (সা)-এর সাহাবাগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ মহামনীষী ইলমে দীনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পর ২১ মুহাররম ৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ১০৩৮ খৃঃ ইসহাবানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার মুর্‌দবাব-এ অবস্থিত। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা)

www.amarboi.org

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা)।

উল্লেখিত হাদীসখানা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর নাম সম্পর্কে প্রায় ৩৫টি অভিমত পাওয়া যায়। বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ঃ

১. আবদুশ শামছ. ২. আবদু আমর. ৩. আবদুল ওয্যা ইত্যাদি।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয়েছে–

১. আবদুল্লাহ ইবনে সাখর ২. আবদুর রহমান ইবনে সাখর ৩. ওমায়ের ইবনে আমের।

উপনাম ঃ আবু হুরায়রা। পিতার নাম ঃ সাখর। মাতার নাম ঃ উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা।

আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ ঃ আবু অর্থ– পিতা, হুরায়রা অর্থ- বিড়াল ছানা। এ হিসেবে আবু হুরায়রা অর্থ হয় বিড়ালের মালিক বা পিতা। একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। তখন রাসূল (সা) রসিকতার সাথে বলে উঠলেন ঃ "يَا اَبَا هُرَيْرَةَ" "হে বিড়ালের পিতা? তখন থেকেই তিনি নিজের জন্য এ নামটি পছন্দ করে নেন এবং এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) ৭ম হিজরী মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল বিন আমর আদ-দাওসীর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন।

রাসূল (সা)-এর সাহচর্য ঃ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ইলম অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে রাসূল (সা)-এর সাহচর্যে আসেন। রাসূল (সা) যখন যেদিকে যেতেন তিনিও সেদিকে যেতেন। এভাবে সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও খেদমতের মাধ্যমে তিনি অধিক হাদীস চর্চার সৌভাগ্য লাভ করেন।

রাসূল (সা)-এর দু'আ ঃ হাদীস বর্ণনার প্রাথমিক অবস্থায় তিনি তাঁর স্মৃতিতে সব কিছু ধারণ করে রাখতে পারতেন না। রাসূল (সা)-কে একথা

www.amarboi.org

বলার পর তিনি তাকে তার 'চাদর বিছিয়ে রাখার' কথা বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) তাতে দু'আ করলেন। এ বরকতের ধারায় তিনি এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেন যে, তিনি যা শুনতেন তা আর কোন দিন ভুলতেন না।

হাদীসে তাঁর অবদান ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে ৮২২টি ও এককভাবে বুখারীতে ৪০৪টি এবং মুসলিম শরীফে ৪১৮টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

ইনতিকাল ঃ হাদীসে নববীর এই মহান খাদেম ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে আদল তথা ন্যায় বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা আলোকপাত করা হল।

আদল শব্দের অর্থ ঃ আদল (اَلْعَدْلُ) আরবী শব্দ। ইহার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ সুবিচার করা, সমান সমান করে মাপা, সমান করে দেয়া, ভারসাম্য রক্ষা করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার করাকে আদল বলে। অর্থাৎ মানুষের জীবনের সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, লেন-দেন, আচার-আচরণ, তথা সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সমুদয় কার্যাদি আঞ্জাম দেয়াকে আদল বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক যাবতীয় কথা ও কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করাকে বুঝায় যাতে সত্যতার মাপকাঠিতে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক না হয়।

আদলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদলের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। কেননা, আদল বা ন্যায়বিচার ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

www.amarboi.org

১. ব্যক্তিগত জীবনে ঃ সমাজ জীবনে যেমন আদলের গুরুত্ব অপরিসীম তেমনিভাবে ব্যক্তিগত জীবনেও আদলের গুরুত্ব কম নয়। যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে তার সার্বিক কাজ-কর্মে ভারসাম্য বা সমতা রক্ষা না করে চলে, তবে তার জীবনে দুর্ভোগের ঘনঘটা অবশ্যম্ভাবী। একজন মানুষ যদি তার প্রতি খোদা প্রদত্ত নি'আমতগুলোর ব্যবহারের সময় আদলের আশ্রয় গ্রহণ না করে তবে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য। ব্যক্তিগত জীবনে একদিকে স্বীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে, অন্য দিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের মাঝে আদল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কাউকেও অধিক স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের উদ্ভব হবে এবং পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرٍ مِنْ نُوْرٍ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِهِمْ وَمَاوُلُّوْا.

"ন্যায় বিচারকগণ আল্লাহর কাছে নুরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। যারা তাদের বিচার কার্যে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করবে।" (মুসলিম)

২. সামাজিক জীবনে ঃ ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় মানুষের সামাজিক জীবনেও আদল বা ন্যায় বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আদল না থাকার কারণে মানব জীবনের সর্বস্তরে অন্যায়-অবিচার সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াতে শুরু করে। স্বভাবগতভাবেই মানুষ স্বার্থপর। যে কোন মূল্যে মানুষ স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। চাওয়া-পাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি বশেই সে লোভের শিকার হয়। লোভ-লালসা থেকেই মনুষ্য অন্তরে ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শত্রুতা জন্ম লাভ করে। শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মানুষ মানবীয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিস্মৃত হয়ে দানবীয় হিংস্রতায় মেতে উঠে। ফলে সে যে কোন উপায় তার স্বার্থকে চরিতার্থ

www.amarboi.org

করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং জ্ঞান বিবেচনা হারায়ে অন্যের প্রতি অবিচার করে ও অধিকার ক্ষুণ্ন করে। তখনই মানব জীবনে শান্তি-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ জীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মানব সমাজ অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ، اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ.

"আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা কর তখন পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে, আল্লাহ তোমাদের কতই না উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন! (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

"তোমাদের (প্রত্যেক বিচার কাজে) দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও।" (সূরা আত-তালাক ঃ ২)

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ঃ ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আদলের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় পর্যায়ে যদি কোন শ্রেণীর মানুষকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় বা জাতীয় উন্নয়নে কোন এলাকার গুরুত্ব বেশী পায় অন্য শ্রেণী বা এলাকার লোক বঞ্চিত হয় তখন শ্রেণী ও এলাকাভিত্তিক বৈষম্যের কারণে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে এবং এক পর্যায়ে গৃহযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। তাতে করে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে দেশের স্বাধীনতাও বিপণ্ন হয়ে যেতে পারে।

জাতীয় জীবনের ন্যায় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আদলের ভূমিকা অপরিসীম। এই বিশ্বায়নের যুগে মুক্ত বাজার অর্থনীতিসহ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদলের কোন বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের চরম উন্নতিতে আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রসহ আধুনিক মরণাস্ত্রে অস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। যে কোন এক শাসকের হঠকারী সিদ্ধান্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপেই সারা বিশ্ব ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আদল বা ন্যায় বিচারের নীতিই অনুসরণ করা অধিক প্রয়োজন।

www.amarboi.org

বিচার ব্যবস্থায় আদলের ভূমিকা ঃ বিচার ব্যবস্থায় আদলের গুরুত্ব সর্বাধিক। মানুষ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েই বিচার প্রার্থনা করে। সে ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার পাওয়াই হচ্ছে বিবেকের দাবী। আর মানুষ মাত্রই সুবিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। আদালতে যেমন ন্যায় বিচারের প্রয়োজন; তেমনিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে আদল তথা ন্যায় বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"যখন তুমি বিচার কর তখন লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবে। কারণ আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন" (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪২)

وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"তোমরা ইনসাফ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১. **স্বজনপ্রীতির কোন অবকাশ নেই ঃ** ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আত্মীয় ও আপনজনের প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা যাবেনা। ইসলামী আদালতে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল ও আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই সমান। এখানে স্বজনপ্রীতির কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ، اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا، فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا، فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অটল থাক এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতা মাতা ও আত্মীয়দের ওপর পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এ অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তার দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের কামনা বাসনার অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিরত থেকো না। তোমরা যদি পেঁচালো কথা বলো, অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى.

"তোমরা যখন বিচারকের আসনে বসে কথা বলো তখন ন্যায় কথা বলো। যদিও সে তোমার নিকট আত্মীয় হয়।" (সূরা আনআম ঃ ১৫২)

২. নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আসামী অথবা ফরিয়াদীর সম্পর্কে তার নিকট আত্মীয় ও অধীনস্থ সকল দাস-দাসীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে সাক্ষ্যদাতাদের মন পক্ষপাত দুষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। একবার হযরত আলী (রা)-এর একটি বর্ম এক ইয়াহুদী চুরি করে ছিল। হযরত আলী (রা) তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলেন। বিচারক হযরত আলী (রা)-কে সাক্ষী হাজির করতে বললেন। তিনি তাঁর পুত্র হাসান (রা) ও একজন চাকরকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করলেন। বিচারক স্বজনদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে হযরত আলী (রা)-এর মামলা খারিজ করে দেন। মূলতঃ বর্মটি হযরত আলী (রা)-এর ছিল। এ বিচারে হযরত আলী (রা) একটুও নারাজ হননি; বরং তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অদালতের রায় মেনে নিয়েছিলেন। ইয়াহুদী ইসলামের এ বিচার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যায়। এটাই ছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আইনের শাসন।

৩. আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান ঃ ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় আইনের

www.amarboi.org

দৃষ্টিতে সকলেই সমান; কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। রাজা-বাদশাহও যদি কোন প্রজার ক্ষতি সাধন করে তবে আদালতে তারও বিচার হবে। একবার দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন লক্ষ্য ভেদের জন্য তীর নিক্ষেপ করেছিলেন হঠাৎ একটি তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে এক বিধবার ছেলের দেহে বিদ্ধ হয় এবং মারা যায়। বিধবা বিচারকের দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে বিচারক সুলতানের বিরুদ্ধে সমন জারি করে তাকে আদালতে হাজির করলেন এবং ইসলামী ফৌজদারী বিধি মতে তার বিচার করলেন।

৪. আদালতে মামলা দায়েরের পর ব্যক্তিগতভাবে আসামীকে ক্ষমা করা যায় না ঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কারো বিরুদ্ধে কোন বিষয় অভিযোগ থাকলে তা আদালতে পেশের পূর্বেই বিষয়টি যদি ব্যক্তিগত হয়ে থাকে তা ব্যক্তিগতভাবে আর সামষ্টিগত হয়ে থাকে তা সামষ্টিগতভাবে ক্ষমা করার সুযোগ থাকে। আদালতে পেশের পর তা কেউ ক্ষমা করতে পারে না। সকলকেই আদালতের রায় মেনে নিতে হবে। রাসূল (সা)-এর যামানায় একটি চাদর চুরির অপরাধে এক ব্যক্তিকে তাঁর দরবারে হাজির করা হয়। মহানবী (সা) তার হাত কেটে ফেলার আদেশ প্রদান করলে অভিযোগকারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সা) মাত্র ত্রিশ দিরহামের একটি চাদরের জন্য তাঁর হাত কাটা যাবে ? আমি চাদরখানি তার কাছে ধারে বিক্রি করে দিচ্ছি। রাসূল বললেন, আমার নিকট বিচার দায়ের করার পূর্বে কেন এটা করলে না।

৫. ন্যায় বিচার করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন ঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধী ও অপরাধীণীর প্রতি কোন মায়া-মমতা ও সহানুভূতি দেখানো একেবারে নিষিদ্ধ। এরূপ করা হলে বিচার ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে পড়ে এবং অপরাধী অপরাধ করতে উৎসাহবোধ করে। তাই অপরাধ দমনের জন্য ন্যায় বিচার করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

www.amarboi.org

"যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও তবে শাস্তি বিধানের বেলায় যেন অপরাধী ও অপরাধিনীর প্রতি কোন প্রকার দুর্বলতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না কর। (সূরা আন-নূর ঃ ২)

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর ভূমিকা ঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর সাক্ষ্যের ওপরই প্রায় সবক্ষেত্রে রায় নির্ভর করে থাকে। কাজেই মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করলে সঠিক বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অপর দিকে উৎকোচ ও উপঢৌকনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে যায়। তাই কুরআনে সর্বক্ষেত্রে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا، هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অবিচল ও অটল থাকো। আর কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও নিজেরা ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার (আদল) কায়েম করো। এটাই আল্লাহ্ ভীতির অতি নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮)

শিক্ষা

১. এক ঘণ্টার ন্যায় বিচার ষাট বছরের ইবাদতের সমান।

২. এক ঘণ্টার ন্যায় বিচার করা রাতভর নামায পড়া ও দিনে রোযা রাখার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

৩. এক ঘণ্টার অত্যাচার আল্লাহ্র কাছে ষাট বছর ব্যাপী নাফরমানী করার চেয়েও মারাত্মক।

৪. আমাদের পারিবারিক জীবনে আদল তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-৫

হিজাব বা পর্দা

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) وَمَيْمُوْنَةَ اِذَا اَقْبَلَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لاَيُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ. (احمد، ترمذى، ابو داود)

অর্থ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) এসে প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা) হযরত উম্মে সালমা ও হযরত মায়মুনা (রা)-কে বললেন ঃ তোমরা লোকটি (ইবনে উম্মে মাকতুম রা.) থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটিতো অন্ধ সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

শব্দার্থ ঃ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) ঃ একদা তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। وَمَيْمُوْنَةَ ঃ এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)। اِذَا اَقْبَلَ ঃ হঠাৎ উপস্থিত হলেন। اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ঃ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)। فَدَخَلَ عَلَيْهِ ঃ অতপর ঃ প্রবেশ করলেন। فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা) বললেন। اِحْتَجِبَا مِنْهُ ঃ তোমরা লোকটি (ইবনে উম্মে মাকতুম রা.) থেকে পর্দা কর। فَقُلْتُ ঃ আমি

www.amarboi.org

বললাম। يَا رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা)। اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى ঃ লোকটি কি অন্ধ নয়? لَا يُبْصِرُنَا ঃ সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) ঃ তখন রাসূল (সা) বললেন। اَفَعَمْيَا وَانِ اَنْتُمَا ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ঃ তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?

ব্যাখ্যা ঃ নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলেও এ সহজাত প্রবৃত্তিগত আকর্ষণ হতে মুক্ত নয়। ইসলাম যাবতীয় ব্যভিচার ও অনাচারকে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ব্যভিচারের সমুদয় উপকরণ এবং উপলক্ষ্যসমূহকেও হারাম করে দিয়েছে। যেহেতু নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও নারী-সৌন্দর্য যত্র-তত্র প্রকাশ করা ব্যভিচারের পথকে সুগম করে দেয়, পুরুষকে নারীর মোহনীয় দৈহিক রূপ-লাবণ্যের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তার সাথে অবৈধ যৌনাচারে প্রলুব্ধ করে, তাই ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশাকে নিষেধ করে দিয়েছে, নারী জাতির সৌন্দর্য চর্চার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এককথায় সমাজ দেহকে অশ্লীলতা, যৌন অনাচার, ব্যভিচার ও দুশ্চরিত্রতা হতে রক্ষা করার নিমিত্তে ইসলাম নারী-পুরুষের জন্য পর্দা প্রথা প্রবর্তন করেছে। পুরুষকে নারীর পর্দা প্রথা পালনে সহযোগিতা করা ও তাদের পর্দা পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার আদেশ দান করেছে। নারী-পুরুষকে একে অপরের থেকে যুক্তিসংগত দূরত্ব বজায় রাখতে আদেশ করেছে। পুরুষকে তার জন্য হালালকৃত মহিলার সৌন্দর্য উপভোগে তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। নারীকে তার রূপ-লাবণ্য, দৈহিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা তার স্বামী বা মুহরিম পুরুষগণ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যার ফলে সত্যিকার ইসলামী সমাজ পাশ্চাত্যের এহেন নব্য জাহিলিয়াতের কুফল হতে মুক্ত রয়েছে। সত্যিকার অর্থে তথায় নারী মর্যাদা অক্ষুণ্ন আছে, নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে মধুর সম্পর্ক ও প্রেম-ভালবাসার প্রগাঢ় বন্ধন অটুট রয়েছে যা অনৈসলামী সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থ থেকে এই হাদীসটি চয়ন করা হয়েছে। মুসনাদে আহমদ ও জামে আত-

www.amarboi.org

তিরমিযী গ্রন্থদ্বয়ের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। আবু দাঊদ গ্রন্থের পরিচিতি ৩নং দারসে দেখুন।

মুসনাদে আহমদ

মুসনাদে আহমদ হিজরী তৃতীয় শতকের এক অতুলনীয় হাদীস গ্রন্থ। মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীস এ বিরাট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (ফতহুর রব্বানী ঃ ১ম খণ্ড পৃ ঃ ৯)

এ গ্রন্থ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সংকলন করেন। তিনি বাগদাদে ১৬৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হাদীস অধ্যয়নের শুরু থেকেই মুখস্থ করার সাথে সাথে লিখার কাজেও মনোনিবেশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। (মুকাদ্দামা মুসনাদ হায়াতে আহমদ ইবনে হাম্বল)

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সকল সহীহ হাদীস সংগ্রহ করা। এ লক্ষ্যে তিনি জীবন ভর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ করেছিলেন। তিনি সর্বমোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হাদীস সংগ্রহ করে তা থেকে যাচাই বাছাই করে ৩০ হাজারের কিছু বেশী হাদীস মুসনাদে সন্নিবেশিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্রের আরো এক হাজার হাদীস সংযোজনের ফলে চল্লিশ হাজার হাদীসে উন্নীত হয়। (আল-হিত্তা ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তা পৃঃ ১১১)

ইমাম আহমদ একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত মতবাদকে অস্বীকার করার কারণে খলীফার কারাগারে বহুবিধ নির্যাতনের পর ২৪১ হিজরী সনে ৭৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদ নগরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া ১১ খণ্ড পৃঃ ৩৩৫)

জামে আত-তিরমিযী

আলোচ্য হাদীসখানা জগৎ বিখ্যাত ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের অন্যতম বিশুদ্ধ ও জনপ্রিয় হাদীস গ্রন্থ তিরমিযী শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন মুহাম্মদ বিন ঈসা। পূর্ণ নাম আল-ইমামুল হাফিয আবু ঈসা

www.amarboi.org

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাতা ইবনে মূসা আত-তিরমিযী। তিনি জীহুন নদীর তীরে তিরমীয নামক প্রাচীন শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি কুরআন হিফ্য করেন। শৈশবে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য মুসলিম জাহানের বিখ্যাত হাদীসের কেন্দ্রসমূহে বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেন। বিশেষ করে কুফা, বসরা, খুরাসান, ইরাক ও হিজাযের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম তিরমিযী তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার শোনার পর তিনি বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করতে সমর্থ হতেন। তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত কয়েকখানি হাদীস শুনেছেন কিন্তু তার সাথে তাঁর কোন দিন সাক্ষাৎ হয়নি। একবার হজ্জে যাওয়ার পথে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার থেকে হাদীস শুনার বাসনা প্রকাশ করেন। মুহাদ্দিস পথিমধ্যেই তা মুখস্থ পাঠ করেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসসমূহ মুখস্থ করে ফেলেন এবং পাঠ করে শুনান। এ অবস্থা দেখে তার স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করার জন্য আরও চল্লিশটি হাদীস শুনান যা ইমাম তিরমিযী আর কোন দিন শুনেন নাই। তিনি উহা শুনার সাথে সাথে মুখস্থ করে নিলেন এবং তাকে শুনিয়ে দিলেন। তাতে কোন একটি শব্দও ভুল হয় নাই। (মুকাদ্দামাহ তরজমানুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬১)

তিনি ইমাম বুখারীর স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। হাদীস প্রণয়নে তিনি ভাষার পাণ্ডিত্য, সংকলনের কলাকৌশল, মাসয়ালা-মাসায়েলের বিন্যাসে এক অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যাকে মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় "জামে" বলে।

ইনতিকাল ঃ হাদীসের এই মহান খাদেম তিরমীয শহরে ২৭৯ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজি'উন। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া খণ্ড ঃ ১১ পৃ ঃ ২২)

রাবী পরিচিতি ঃ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া (রা)।

নাম ঃ হিন্দ, উপনাম ঃ উম্মে সালামা, পিতার নাম ঃ সুহাইল, মাতার নাম ঃ আতিকা বিনতে আমের।

www.amarboi.org

বংশধারা ঃ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযুম।

প্রথম বিবাহ ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) প্রথমে তার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ নবুয়াতের শুরুতেই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে।

হিজরত ঃ ইসলাম গ্রহণের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেন।

রাসূল (সা)-এর সাথে বিবাহ ঃ তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে তার স্বামী আবদুল্লাহ ওরফে আবু সালামার মৃত্যুর পরে রাসূল (সা)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। আবু সালামার ইনতিকালে তিনি যে ব্যথা পেয়েছেন রাসূল (সা)-এর সাথে বিবাহের পরে তাঁর সে ব্যথা লাঘব হয়ে যায়। রাসূল (সা)-এর ঘরে উম্মে সালামার কোন সন্তান হয়নি। পূর্বের স্বামী আবু সালামার ঘরে তাঁর দু'ছেলে ও দু'মেয়ে জন্মলাভ করেছিল।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) ছিলেন পূর্ণ জ্ঞানবান ও বিশুদ্ধ বিবেচক একজন গুণবতী নারী। রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণ সকলেই তাঁর বাণী কণ্ঠস্থ করতেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি সর্বমোট ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আপন কন্যা যয়নাব, পুত্র ওমর এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবসহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইনতিকাল ঃ তিনি হিজরী ৫৯ সালে ৮৪ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকি'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজাব শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ পর্দা, যবনিকা, বিনয়, লজ্জা, আড়াল, অন্তরায়, আবরণ।

www.amarboi.org

পর্দার পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের নিজ নিজ রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট হতে আড়াল রাখার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে সে বিধান অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই হিযাব বা পর্দা।

ইসলামে পর্দার স্বরূপ

১. ঘরোয়া জীবনে পর্দা ঃ সাধারণত নারী সামাজের আবাসস্থল হলো নিজ নিজ বাসগৃহ। বাসগৃহেই নারীর অবস্থান শোভনীয়। আল-কুরআনের বর্ণনায় "তারা (নারীরা) তাদের গৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলী যুগের নারীদের মত ঘুরে বেড়াবে না।"

গৃহের অভ্যন্তরে যাতে নারীরা নির্বিঘ্নে চলা-ফেরা করতে পারে এজন্য মুহরিম ব্যক্তিদের সাথে স্বাভাবিক দেখা সাক্ষাত করা জায়েয। অন্যদের সামনে কখনো সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ "তারা যেন স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, স্বামীর সন্তানাদি ব্যতীত অন্য কারো সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"

২. ঘরের বাইরে পর্দা ঃ গৃহের অভ্যন্তরে পর্দা রক্ষা করা যেমন ফরয, ঘরের বাইরেও পর্দা রক্ষা করা তেমন ফরয। ঘরের বাইরের পর্দার বিভিন্ন দিক রয়েছে।

ক. সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা ঃ সামাজিক প্রয়োজনে যখন ঘরের বাইরে যেতে হয়, তখন নারীদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হতে হবে। মেয়েদের সৌন্দর্যের সব জিনিসই আবৃত করে রাখবে। প্রয়োজনের কারণে যা প্রকাশ না করে পারা যায় না, তা ছাড়া। মেয়েদের আপদমস্তকই পর্দার আওতাভুক্ত, তাই সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবে। আর তাদের ঘরে থাকাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অধিক উপযোগী। কেননা, যখন তারা ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাদের পিছু নেয়। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য ও সতীত্ব রক্ষার জন্য পর্দা হচ্ছে এক বিরাট রক্ষাকবচ।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.

www.amarboi.org

"হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণ, কন্যাগণ ও মুসলিম মহিলাগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দেহ ও মুখমণ্ডলকে চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটা তাদেরকে (ভদ্র মহিলা হিসেবে) চেনার পক্ষে সহায়ক হবে, ফলে তারা উত্যক্ত হবে না।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৯)

খ. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখা ঃ নারী-পুরুষ সকলকেই তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হিজাব বা পর্দা পালনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযমের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু দেখার পরই স্বভাবতঃ অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, এজন্য কুরআন মজিদে নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযম তথা দৃষ্টি অবনমিত করার তাকিদ করা হয়েছে। এর অর্থ চক্ষু বন্ধ করে অন্ধের ভূমিকা পালন করা নয় বরং এর দ্বারা চোখের ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা বুঝায়। পর-স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য ও দৈহিক কমনীয়তা দেখে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করা যেমন পুরুষের জন্য হারাম তেমনি পরপুরুষের প্রতি তাকিয়ে যৌন আকর্ষণবোধ করা নারীর জন্যও হারাম। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে কখনো এবং কোন নারী কোন পুরুষকে কখনো দেখতে পারবে না। কারণ দুনিয়ায় বাস করতে হলে চোখ খুলেই বাস করতে হবে। আর চোখ খুলে পথ চলাকালে কোন কিছুর ওপর দৃষ্টি পড়া খুবই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার তাকানো বা অপলক দৃষ্টিতে তাকানোই পাপ।

"হযরত যারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা) এর নিকট আকস্মিক দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ এমতাবস্থায় তুমি তোমার চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে ফেল।" (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে আলী! আমি আশা করি তুমি অন্য মহিলার প্রতি একবার

www.amarboi.org

তাকানোর পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার তাকানোর অনুমতি রয়েছে। দ্বিতীয়বার তাকানোর অনুমতি নেই।" (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য হতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার স্বাদ সে নিজ হৃদয়ে অনুভব করবে।" (তাবারানী)

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেন ঃ "যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের উপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসনাদে আহমদ)

গ. সৌন্দর্য গোপন রাখা ঃ প্রয়োজনে নারীদের ঘরের বাইরে যেতে ইসলামে নিষেধ করা হয়নি। দু'টো শর্তে ঘরের বাইরে নারীদের যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

প্রথম শর্ত ঃ বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরা-ফেরা না করা;

দ্বিতীয় শর্ত ঃ পর্দা রক্ষা করে চলা।

প্রথমতঃ বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরা-ফেরা না করা। অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় এবং যে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন সে স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে পারে। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে ঘুরা-ফেরা না করে যথা সময়ে ঘরে চলে আসবে।

দ্বিতীয়তঃ পর্দা রক্ষা করে চলা। নারীগণ ঘরের বাইরে চলার সময় তাদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্যকে গোপন রাখবে। নিজের মুখ, মাথা, বুক, পিঠসহ সমগ্র শরীর ভালভাবে আচ্ছাদিত করে বের হতে হবে। সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য যৌবনোজ্জ্বল দেহাবয়ব প্রকাশ করে ঘর থেকে বের হওয়া নারীদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নবী কঠোর বাণী উচ্চারণ করে এর মারাত্মক পরিণতির কথা বলেছেন ঃ "সে সব নারী যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ, যারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকের কাছে প্রকাশ

www.amarboi.org

করে, যারা বুক-স্কন্ধ বাঁকা করে একদিকে ঝুঁকে চলে, যাদের মাথা ষাঁড়ের চোটের মত ডানে বামে ঢুলে ঢুলে পড়ে, তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না এবং বেহেশ্‌তের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না, যদিও তাঁর সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম)

وَرِيْحُهَا تُوْجَدُ مَسِيْرَةَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ.

বেহেশ্‌তের সুগন্ধি পাঁচশ' বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)

ঘ. শালীনতা বজায় রাখা ঃ ঘরের বাইরে চলার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। জাহিলী যুগের নারীদের মত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা যাবে না। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের নারীদের ন্যায় রূপযৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়ানো হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَانِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا. وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরাতো সাধারণ নারীদের মতো নও। তোমরা যদি খোদাভীতি অবলম্বন করতে চাও, তবে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলো না। কারণ এর দ্বারা যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তার মধ্যে লালসা জাগতে পারে। আর তোমরা উত্তম ও সহজ কথা বলবে। তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো এবং তোমরা পূর্ববর্তী জাহিলী যুগের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িয়ো না।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৩)

নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্র ঃ পবিত্র ইসলাম পর্দা প্রথা প্রবর্তন করে নারী জাতিকে গৃহবন্দী করেনি বা তাকে সৌন্দর্য প্রকাশে বাধা দানও করেনি, বরং পর্দা প্রথা প্রবর্তন করে ইসলাম নারী মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখারই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বামী যেহেতু তার বৈধ জীবন সংগী তাই

www.amarboi.org

তার নিকট এবং যে সকল পুরুষ তার জন্য মুহরিম, যাদের সংগে তার বিবাহ-শাদি চিরতরে হারাম, যাদের দ্বারা তার শ্লীলতা হানির আশংকা নেই সেসব মুহরিম পুরুষের নিকট এবং যে সকল বালক এখনো নারী-সম্ভোগের ব্যাপারে পরিচিত নয় কিংবা যে সকল সেবক দ্বারা কোনরূপ অনাচার অমঙ্গলের কারণ হবে না তাদের নিকট ছাড়া অপর কারো নিকট নারীকে তার সৌন্দর্য, রূপ লাবণ্য ও দৈহিক কমনীয়তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন অনাচার হতে সমাজকে পূত-পবিত্র রাখা। কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ. وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخْوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَيَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ.

"হে রাসূল! মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয় তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তা সবই জানেন। আর আপনি মু'মিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে, আর স্বত প্রকাশিত সৌন্দর্য ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, আর যেন তারা তাদের বক্ষের উপর ওড়না টেনে দেয়। আর যেন তারা তাদের সৌন্দর্যকে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর,

www.amarboi.org

পুত্র, সৎপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং নারীর গোপনীয় বিষয়ে অনবহিত বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ না করে। আর যেন তারা পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যা দ্বারা তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। (সূরা আন-নূর ঃ ৩০-৩১)

অনুরূপভাবে কুরআন মজিদে নারী জাতিকে এমনভাবে বাক্যালাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা দ্বারা পরপুরুষের অন্তরে যৌনবাসনা জাগ্রত হতে পারে।

পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ ইসলামে পর্দার ব্যবস্থা পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. পর্দা হচ্ছে আনুগত্যের নিদর্শন ঃ পর্দা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর আনুগত্যের নিদর্শন। এ বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যারা আল্লাহর বিধান পালন করবে না তাদের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর পক্ষে সেই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৬)

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

www.amarboi.org

"অতএব, (হে মুহাম্মদ) তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা প্রকাশ পাবে না এবং হৃষ্ট চিত্তে তা কবুল করে নেবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

"আপনি মু'মিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযত করে, আর নিজেদের সাজ্জ-সজ্জা না দেখায়। কেবল সেইসব সৌন্দর্য ব্যতীত যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আর যেন তারা তাদের বক্ষের উপর ওড়না টেনে দেয়।" (সূরা আন-নূর ঃ ১৩)

২. পর্দা পবিত্রতা দান করে ঃ পর্দার কারণে নারী-পুরুষের অন্তরের মন্দ কামনা-বাসনা জাগ্রত হতে পারে না এবং বিকৃত অন্তরের লালসাকে বিদূরিত করে দিয়ে অন্তরকে পবিত্রতা দান করে।

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ.

"তোমরা তাদের (নবী-পত্নীদের) কাছে কিছু চাইতে হলে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৩)

৩. পর্দা হচ্ছে তাকওয়া ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা নারী ও পুরুষের সতর ঢেকে রাখার মাধ্যমে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলাই পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। তবে পরহেজগারীর পোশাকই হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক।

يَابَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ط

www.amarboi.org

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তোমাদের দেহের আবরণ ও সাজসজ্জার বস্ত্র হিসেবে এবং পরহেজগারীর পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক। (সূরা আল-আরাফ ঃ ২৬)

৪. পর্দা হচ্ছে লজ্জার প্রতীক ঃ পর্দা হচ্ছে মানুষের লজ্জার প্রতীক। আর লজ্জা মানুষকে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেয়। উন্নত চরিত্রের প্রতীক হচ্ছে লজ্জাশীলতা। প্রকৃত প্রস্তাবে একথা বলা যায় যে, লজ্জাশীলতাই হলো একমাত্র বিশেষণ যাকে আমরা সব ভাল কাজের মূল বা শিকড় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। হাদীসে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। যে মানুষের মধ্যে হায়া বা লজ্জা নেই তার কোন চরিত্রই থাকতে পারে না। কেননা ইসলামে যে চরিত্র রয়েছে তা হচ্ছে লজ্জা।

اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

"প্রতিটি ধর্মের একটি চরিত্র রয়েছে আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।"

আর পর্দা মানার মাধ্যমেই লজ্জা বা হায়া আছে বলে প্রমাণিত হয় এবং এর দ্বারাই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। পর্দা না মানলে তার মধ্যে লজ্জাও বিরাজ করে না এবং উন্নত চরিত্র গঠনেরও কোন বালাই থাকে না। ঈমান দ্বারা বান্দা এবং মহাপ্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মার পবিত্রতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্মের মহানুভবতা দ্বারা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানুষের অন্তরে যতক্ষণ ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ সে অন্যায় ও অসৎ পথ পরিহার করে চলবে। যখন কোন ব্যক্তি অন্যায় ও পাপকে– তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, অগ্রাহ্য করে সে পথে অগ্রগামী হয়, তখন তার অন্তর হতে লজ্জা নামক বিশেষ গুণটির বিচ্যুতি ঘটে এবং ঈমানের নূর বিনষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন ঃ

اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ.

"লজ্জাশীলতা ও ঈমানকে এক সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যখন একটি উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটি এমনিতেই চলে যায়।" (হাকেম)

৫. পর্দা হচ্ছে আত্মমর্যাদার প্রতীক ঃ পর্দা হচ্ছে মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক। এতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে পর্দা করে না তাকে কেউই ভালবাসে না। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে মানুষ আল্লাহর হুকুম মানতো না।

www.amarboi.org

তারা পরপুরুষ ও পরনারী একে অপরের সাথে হাটে বাজারে অবাধে মেলামেশা করতো। তাদের আত্মসম্মানবোধ বলতে কোন কিছু ছিল না। তাদেরকে লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ "তোমাদের আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছু নেই। আর যার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ নেই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।"

পর্দা ফরয হওয়ার হিকমত

ইসলামে সকল বিধি-বিধান তত্ত্ব, তথ্য ও হিকমতে পরিপূর্ণ। পর্দা ফরয হওয়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য হিকমত হলো ঃ

১. নারীর সতীত্ব রক্ষা করা;

২. দাম্পত্য জীবন সুখময় করে তোলা;

৩. নারী জাতির মর্যাদা সংরক্ষণ করা;

৪. পুরুষকে চোখ ও মনের যেনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা;

৫. সমাজকে কলুষমুক্ত করা;

৬. সমাজ থেকে যিনা-ব্যভিচার উৎখাত করা;

৭. যৌনতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতার পথ রুদ্ধ করা;

৮. সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা;

৯. সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, পর্দা নারীর ভূষণ। বেপর্দায় বেপরোয়াভাবে চলা-ফেরার কারণেই নারী সমাজ আজ পণ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। একমাত্র পর্দাই পারে নারীকে মায়ের সম্মানজনক আসনে সমাসীন করতে।

শিক্ষা

১. পর্দা নারী-পুরুষ সকলের জন্য ফরয।

২. একজন অন্ধ হলেও অপরজনের জন্য তার থেকে পর্দা করতে হবে।

৩. পর্দা লংঘন করলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-৬

স্বামীর অধিকার

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَاخَلَتِ الْجَنَّةَ. (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সে অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অফুরন্ত প্রেম-ভালবাসা আর অনাবিল শান্তির বাঁধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কোন স্ত্রীলোক যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন, স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, সন্তুষ্ট চিত্তে সাধ্যমত স্বামীর খেদমত করেন, তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, স্বামীর মনে আঘাত লাগে এমন আচরণ কখনো না করেন, বিপদাপদে ও দুঃখ-কষ্টে স্বামীর সাথে সমান অংশীদার হন, দীনি কাজে সাহস যোগান, ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন, নিজেও ধৈর্যধারণ করেন– এমন স্ত্রীলোকের উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং তার স্বামীও সন্তুষ্ট হবেন। রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) নিজ হাতে রাসূল (সা)-এর কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিতেন, তাঁর পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন, তাঁর মিসওয়াক শুকনো থাকলে তিনি তা চিবিয়ে মুখের লালায় ভিজিয়ে মসৃণ করে দিতেন এবং সেটাকে তিনি নিজের হেফাজতে রাখতেন। তিনি নিজ হাতে রাসূলের (সা) চুলে দাড়িতে চিরুণী করে দিতেন।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর খেদমত ও সন্তুষ্টির মধ্যে নারী জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা নিহিত। আর এর বিনিময়ে সে পাবে পরম সুখের জান্নাত। তাতে সে অনায়াসে প্রবেশ করার অধিকার রাখবে। উল্লেখিত হাদীসখানায় সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা

www.amarboi.org

বজায় রাখার জন্য স্বামী স্ত্রীর একজনের পরিচালক বা প্রধান হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু উভয় যদি সমমর্যাদার এবং সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। যেসব জাতি কার্যত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করার চেষ্টা করেছে সেসব জাতির মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে এ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম স্বভাব প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে একজন প্রধান ও পরিচালক এবং অপরজনকে তার অধীনে বানানো প্রয়োজন মনে করেছে এবং কর্তৃত্বের জন্য সেই সম্প্রদায়কে নির্বাচন করেছে যারা প্রকৃতিগতভাবে এ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। (হুকুকুজ জাওজাইন)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ তিরমিযী।

জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থের পরিচিতি ৫নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ উম্মে সালামা।

উম্মে সালামার পূর্ণ পরিচিতি ৫নং দারসে দেখুন।

ইসলামে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সুখ শান্তি বেশীর ভাগ নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির উপর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মধ্যে জৈবিক কামনা-বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই নারী পুরুষের পরস্পর পরস্পরের প্রতি রয়েছে চরম আকর্ষণ। আর এ আকর্ষণের কারণে একজন পুরুষও একজন নারী আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের সূচনা করেন। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এটি কোন সাময়িক দুনিয়ার সম্পর্ক নয়। স্বামী-স্ত্রীর এ সম্পর্ক চিরস্থায়ী। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারলে জান্নাতেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا.

“তাদের স্ত্রীগণকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী; স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়সে সমকক্ষ।” (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৫-৩৭)

www.amarboi.org

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ.

"দুনিয়াতে যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল পরকালে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকিরা পরস্পর বন্ধুই থাকবে।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো চরম বন্ধুত্বের। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে একে অপর থেকে উপকৃত হবে ও প্রশান্তি লাভ করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তার নিকট শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, হৃদ্যতা, দয়া ও করুণা সঞ্চার করে দিয়েছেন। (সূরা রূম ঃ ২১)

সুন্দর, মধুময় ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রিয় নবী (সা) গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি নব দম্পতির জন্য এভাবে দু'আ করতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বরকত দিন। তোমাদের পরস্পরের দাম্পত্য জীবনে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর তোমাদের মধ্যে কল্যাণের সম্পর্ক দান করুন। (আবু দাউদ)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিরেট ভালবাসার সম্পর্ক। স্বামী- স্ত্রীর জীবনটা হচ্ছে প্রেম-প্রীতির ও ভালবাসার জীবন। ইহা সুন্দর ও মধুময় রূপে গড়ে তুলতে হলে একজনের প্রতি অপরজনের যে হক বা অধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

হাদীসের আলোকে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

www.amarboi.org

১. স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দান করেছেন। তাই স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। আল্লাহর বাণী ঃ

الرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

"পুরুষরা নারীদের পরিচালক। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে একজনের উপর অপরজনের মর্যাদা দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করেন।" (সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

" নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)

ইসলাম যেভাবে স্বামীকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছে সেভাবেই সে হক আদায় করার ক্ষেত্রে কঠোর তাকিদ করেছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

"পুরুষ তার স্ত্রী পরিবার-পরিজনের পরিচালক (দায়িত্বশীল) এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। (বুখারী)

আল্লামা ইমাম বায়জাবী (র) বলেন ঃ অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি বিপুল কর্মশক্তির এবং পারিবারিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বের কারণেই নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেন ঃ "পুরুষদেরকে প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু গুণ, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা দান করেছেন যা নারীদের দেয়া হয়নি বা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এ কারণে পারিবারিক সংস্থায় পুরুষই ব্যবস্থাপক হবার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে নারীদেরকে প্রকৃতিগতভাবেই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে

www.amarboi.org

দাম্পত্য জীবনে পুরুষদের হিফাযতে ও তত্ত্বাবধায়নের অধীন হয়ে থাকাই তাদের বাঞ্ছনীয়।" (সূরা আন-নিসা, টীকা ঃ ৫৮)

ইবনুল আরাবির মতে, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বের তিনটি কারণ রয়েছে। যথা ঃ

প্রথমতঃ জ্ঞানের পরিপক্কতা;

দ্বিতীয়তঃ দীনি দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণ যোগ্যতা;

তৃতীয়তঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দক্ষতা।

নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ

প্রথমতঃ সৃষ্টিগত, দ্বিতীয়তঃ দায়িত্বগত।

এ দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে ।

প্রথমতঃ পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্ম ক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইহা সৃষ্টিগত।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকেন। ইহা দায়িত্বগত। প্রথম কারণটি হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতা ভিত্তিক।

তাছাড়া একথা বলা যেতে পারে যে, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দুটো বিষয় অপরিহার্য ছিল ঃ (১) যাকে শাসক বানানো হবে তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসন কার্যের যোগ্যতা; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীগণ যখন বিয়ের সময় নিজের খোর পোষ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে তখনই সে পুরুষের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়। (মা'আরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অধিক । নারীর তুলনায় পুরুষের শারিরীক অবস্থা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। গঠন ও আকৃতির দিক দিয়েও নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরুষের গঠনাকৃতির সাথে পার্থক্য রয়েছে। এমনকি যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই এক ধরনের মনে হয়, সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যহীন।

এখানে নারীদের সৃষ্টিগত পার্থক্য নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. পুরুষের উচ্চতার চেয়ে নারীদের উচ্চতা ১২ সেন্টিমিটার কম।

২. পুরুষের গড় ওজনের চেয়ে নারীদের গড় ওজন ৪.৫ কিলোগ্রাম কম।

৩. পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনায় নারীর হৃৎপিণ্ড ৬০ গ্রাম কম।

৪. পুরুষের মগজের ওজন গড়ে ৪৯ আউন্স আর নারীর মগজের ওজন গড়ে ৪৪ আউন্স। নারীর মাথার মগজের বক্রতা ও প্যাচ অনেক কম এবং তার আবরণগুলোর ব্যবস্থাপনাও অসম্পূর্ণ।

৫. হৃৎপিণ্ডের পরেই দেহের যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে কিডনী তার মধ্যে অন্যতম একটি অঙ্গ। কিডনী শরীরের পানির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণসহ অনেক কাজ করে থাকে। এই কিডনি সচল থাকলে জীবন সচল থাকে আর এটি বিকল হয়ে গেলে জীবন-গাড়িও বিকল হতে বাধ্য। গড়পড়তায় প্রত্যেকটি কিডনির ওজন পুরুষের ক্ষেত্রে ১৫০ গ্রাম এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৩৫ গ্রামের মত।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু পুরুষদের তুলনায় অনেক দুর্বল। সৃষ্টিগত গুণাবলীর দিক দিয়েও পুরুষলোক নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। চিন্তা-শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস-ধৈর্য, বীরত্ব, দৈহিক শক্তি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দিক দিয়েও পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। একারণেই মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

২. স্বামীর আনুগত্য করা ঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন এক স্থায়ী এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, যা নিয়ে গোটা জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে

www.amarboi.org

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য যেমন কর্তব্য, তেমনি বিরাট মর্যাদার বিষয়ও বটে। মনে রাখতে হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিছক শুধু মহব্বত ও ভালবাসারই নাম নয়। বরং মহব্বত ও ভালবাসার সাথে সাথে স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করাও স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রীর সকল কাজের লক্ষ্যবস্তু হবে দু'টি। যথা ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর সন্তোষ লাভ।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীর সন্তোষ লাভ।

আর স্বামীর সন্তোষ লাভের চেষ্টা করাও আল্লাহর সন্তোষেরই অধীন। এ কারণেই স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ পালন, তার সাথে সদাচরণ, তার সন্তোষ অর্জন ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বদা অনুগত থাকবে। কেননা, যারা নেক, সৎচরিত্রসম্পন্না স্ত্রী তারা স্বামীর অনুগত ও খেদমতগার হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ.

"পুণ্যবতী স্ত্রীলোক তারাই যারা স্বামীর অনুগত হয়।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

"যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো, রমযানে রোযা রাখলো, লজ্জাস্থানের হিফাযত করল, স্বামীর আনুগত্য করল তবে সে অবশ্যই বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত)

স্বামীর আনুগত্যের সীমা ঃ পারিবারিক জীবনে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য ও প্রাধান্য মেনে চলতে হবে। স্বামীর ন্যায়সঙ্গত ও শরীয়তসম্মত কাজে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করবে না। যদি শরীয়তসম্মত নয় এমন ধরনের কোন কাজে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে, তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করা।

لاَ تُطِيْعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِيْ مَعْصِيَةٍ.

"গুনাহের কাজে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মানবে না।" (বুখারী)

www.amarboi.org

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"স্রষ্টার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. স্বামীকে হাসিমুখে বরণ করা ঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন এক নিবিড় ও পবিত্রতম যা স্ত্রীর জীবনে শুরু হয় দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিন থেকে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নিত্যদিনের সাথী হতে পারে যখন স্বামী বাহির থেকে ঘরে ফিরে তখন হাস্যজ্জোল মুখে তাকে বরণ করে নিতে পারলে।

وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ.

"স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়।" (ইবনে মাজাহ)

৪. যৌন মিলনের দাবি পূরণ করা ঃ নারী-পুরুষের গভীর প্রেমের প্রকাশ হতে পারে যৌন মিলনের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে পুরুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই যখন স্বামী স্ত্রীকে যৌন মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন প্রেম-ভালবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে সানন্দচিত্তে এ দাবী পূরণ করা কর্তব্য।

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَاتِهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

"স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে যায়; এমনকি চুলার নিকট রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও। (তিরমিযী)

৫. স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ না করা ঃ স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া বিবাদ করে অথবা কোন সামান্য মনমালিন্যের কারণে স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র রাত্রি যাপন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে স্বামী স্ত্রীর প্রতি নাখোশ হয়। অনেক সময় এর ফলে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং হিতে-বিপরীত হয়ে যায়। ফিরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে পৃথক হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণ সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফিরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।" (বুখারী)

৬. স্বামীর সম্পদের হিফাযত করা ঃ স্ত্রী হচ্ছে ঘরের রাণী। স্বামীর গৃহের ধন-সম্পদ, আসবাব-পত্র ও ছেলে-মেয়ে সবকিছুরই হেফাযত করা স্ত্রীর

www.amarboi.org

কর্তব্য। ভবিষ্যত বংশধরদের রক্ষা করার জন্য গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ গৃহের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হলো স্ত্রীর।

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهٖ وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

"স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের পরিচালিকা, ছেলে-মেয়ে রক্ষণাবেক্ষণকারিণী কর্ত্রী। (বুখারী, মুসলিম)

৭. স্বামীর গোপন কথা প্রকাশ না করা ঃ পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় স্নেহ-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন থাকলেও প্রত্যেকের কতগুলো ব্যক্তিগত বিষয় থাকে। সেগুলো গোপন রাখা একান্ত প্রয়োজন। একত্রে বসবাস করতে গেলে অনেক সময় কোন কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, ও মনোমালিন্য হওয়াটা স্বাভাবিক। মতের অমিল হলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ দেখা দিতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে আপোষে মিমাংসা করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, যাতে সব বিষয় গোপন থাকে। বাইরে প্রকাশ পেলে উভয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় ও সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। বিশেষ করে স্বামী যখন প্রেম ভালবাসার নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগে গোপনে লিপ্ত হয়। এ বিষয় গোপনীয়তা রক্ষা করা স্ত্রীর একান্ত দায়িত্ব। একদা মহানবী (সা) স্ত্রীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ

هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ.

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা অন্যদের কাছে বলে দেয়? তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠল ঃ

اَیْ اللّٰهُ اِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ.

আল্লাহর শপথ, পুরুষেরাও যেভাবে (সহবাসের) গোপন কথা বলে দেয়, তেমনিভাবে মেয়েরাও তা প্রকাশ করে দেয়।

একথা শুনে মহানবী (সা) বললেন ঃ "তোমরা কি জানো এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করল, অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের

www.amarboi.org

প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে দেখতে থাকলো। (তিরমিযী, নাসাঈ)

৮. স্বামীর উপঢৌকন সানন্দে গ্রহণ করা ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একে অপরের মধ্যে উপহার উপঢৌকন বিনিময় করা উচিৎ। বিশেষভাবে স্বামীর করণীয় হলো, মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যসামগ্রী দেয়া। অমনিভাবে স্ত্রীরও তার সামর্থ্যানুযায়ী স্বামীকে উপহার দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে উভয়ের পারস্পরিক আকর্ষণ কৌতুহল ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকেই থাকবে অপরের প্রতি সদাসন্তুষ্ট। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর উপদেশ প্রণিধানযোগ্য ঃ

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا.

"তোমরা পরস্পর উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান করো, তাহলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হবে।" (তিরমিযী ও আহমদ)

৯. স্বামীকে দীনদার বানানো স্ত্রীর দায়িত্ব ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য হচ্ছে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের জন্য পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করবে। বিশেষ করে কোন স্বামী যদি দীনদারীর ক্ষেত্রে উদাসীন বা অমনোযোগী হয় তাহলে স্ত্রীর দায়িত্ব তাকে দীনদার বানানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। শুধু ফরয ইবাদত নয়, এমনকি সুন্নাত ও নফল ইবাদতের জন্যও উৎসাহিত করা। রাসূল (সা) বলেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضِجَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءِ.

"আল্লাহ তা'আলা রহমত দান করবেন সেই স্ত্রীকে যে রাতের বেলা উঠে নিজে নামায পড়বে এবং তার স্বামীকেও সে জন্য জাগাবে; স্বামী উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে। (ইবনে মাজাহ)

স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর ক্ষেত্রে মহিলারা বড়ই অবহেলা প্রদর্শন করে

www.amarboi.org

থাকে। স্বামীকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কোন চেষ্টাই তারা করে না। অথচ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আত-তাহ্রীম ঃ ৬)

১০. স্বামীর খেদমত করা ঃ স্ত্রী যেমনভাবে স্বামীর আনুগত্য করবে তেমনি সাধ্যমত তার সেবাযত্ন ও খেদমত করবে। স্বামীর খেদমত করা ও পরিচর্যা করা স্ত্রীর জন্য সম্মান ও গর্বের বিষয়। এতে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। স্বামীর খেদমত দ্বারা অনায়াসে জান্নাত খরিদ করা যায়। স্ত্রীর উচিত আচার-আচরণে নমনীয় হওয়া। কথা-বার্তায় ভদ্রতা, নম্রতা ও শিষ্টাচারিতা রক্ষা করা। স্বামী যা অপছন্দ করেন তা পরিত্যাগ করে চলা এবং যে কাজ-কর্ম তার মনপূত হয় তা করা। স্বামীর মন-মানসিকতা ও মেজাজ বুঝে কথা বলা। স্বামীর রুচির সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নেয়া। বুদ্ধিমতি মহিলারা স্বামীর মন-মানসিকতা উপলব্ধি করে তার মর্জি মত চলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্বামীর মন জয় করে ফেলে।

১১. সতীত্বের হিফাযত করা ঃ চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষের ভাল-মন্দের মাপকাঠি। চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত করাই হচ্ছে বিয়ের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য। আর সতী-সাধ্বী নারীরা হলো উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী। তারা তাদের সতীত্বকে রক্ষা করে চলে, কখনো তারা পরপুরুষের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় না। সর্বদা তারা আমানতের হিফাযতকারী হয় এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। প্রত্যেকেরই এ পবিত্রতা রক্ষা করা অপরিহার্য। এ জন্য স্ত্রীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পালনীয় কর্তব্য হল সতীত্ব রক্ষা করা। এ জন্য শুধু ভিন্ পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তার মান-সম্ভ্রম সামান্যতম কলংকিত বা সন্দেহযুক্ত না হয় সে দিকেও সদা-সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১২. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া ঃ স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। অনুমতি ছাড়া বাইরে গমন করা কোন

www.amarboi.org

অবস্থাতেই প্রশংসনীয় হতে পারে না বরং তার জন্য উত্তম হলো ঘরে অবস্থান করা। এটা তাদের কর্মক্ষেত্র ও নিরাপদ স্থান এবং স্বভাবসম্মত পরিবেশ। যাতে পরপুরুষ তাকে না দেখে তিনিও পর-পুরুষকে না দেখেন। অবশ্য বিশেষ কোন কারণে বাইরে যাবার প্রয়োজন দেখা দিলে শর'য়ী পর্দা রক্ষা করে বের হবার অনুমতি রয়েছে। নারীদের প্রকৃত অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ.

"নারীগণ যেন তাদের ঘরেই অবস্থান করে।" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৩৩)

নারীদের ঘরে অবস্থানকে সুখ-শান্তির ও কল্যাণের স্থান বলা হয়েছে ঃ

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

" নারীদের জন্য তাদের ঘরই সুখ-শান্তির ও কল্যাণের স্থান।" (তিরমিযী)

১৩. পর্দা রক্ষা করে চলা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ সকলের জন্য পর্দা ফরয করে দিয়েছেন। ঘরের অভ্যন্তরে থাকাকালীন সময় যেমন পর্দার বিধান পালন করা ফরয; তেমনিভাবে ঘরের বাইরে গেলেও তা পালন করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى.

"তোমরা পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের ন্যায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করে সাজ-গোজ করে বের হবে না।" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৩৩)

১৪. স্বামীর গৃহে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়া ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। আল্লাহর নবী বলেন ঃ "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হলো এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোকদেরকে স্থান দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর। (ইবনে মাজাহ)

১৫. স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক নিয়ামতের যেমন শোকর আদায় করা প্রয়োজন তেমনি মানুষের ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষের

www.amarboi.org

মর্যাদা বৃদ্ধি করে, একজনের প্রতি অপরজনকে অনুরক্ত করে তোলে, প্রেম-ভালবাসা মহব্বত বাড়িয়ে দেয়। তাই স্বামীর ভাল কাজের এবং সহযোগিতা দানের জন্য ধন্যবাদ দেয়া তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য।

১৬. মৃত স্বামীর জন্য দু'আ করা ঃ মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর দু'আ করা কর্তব্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির উদাহরণ হলো পানিতে পড়া সাহায্য প্রার্থী সে ব্যক্তির মত, যে তার মা, বাপ এবং ভাই বন্ধুর দু'আর অপেক্ষায় থাকে। যখন তার কাছে তাদের দু'আ পৌঁছে, তখন তার কাছে তা দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয়তম মনে হয়। আল্লাহ কবরবাসীদেরকে যমীনবাসীদের দু'আর কারণে পাহাড় পরিমাণ রহমত দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উপহার হচ্ছে ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। (বায়হাকী)

শিক্ষা

১. স্ত্রী তার সকল কাজে স্বামীকে খুশি রাখতে হবে।

২. স্বামীকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট করা যাবে না।

৩. স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

www.amarboi.org

দারস-৭

স্ত্রীর অধিকার

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَتَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ. (ابو داود)

অর্থ ঃ হযরত হাকিম ইবনুল মু'আবিয়া কুশাইরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বামীর কাছে আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার কি কি? রাসূল (সা) বললেন ঃ তার হক এটাই যে, তুমি যখন আহার করবে, তখন তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন পোশাক পরিধান করবে, তখন তাকেও পোশাক দেবে, তার মুখে কখনো প্রহার করবে না, তাকে কখনো অশ্লীল গালি দেবে না। আর তার সাথে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ করলে তাকে ঘরে রেখেই তা করবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য পবিত্র হাদীস খানায় স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামী তার স্ত্রীকে সামর্থ্য অনুযায়ী খোরপোষ প্রদান করবে। স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় ও অসদাচরণ করে, তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে তাকে নম্র ও কোমল ভাষায় উপদেশ দান করতে হবে, যাতে করে সে তার ভুল বুঝতে পারে। তাতেও যদি ফল না হয় তখন বিছানা পৃথক করে দেবে। কিন্তু উভয়ের বিছানা এক ঘরেই থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাকে পৃথক ঘরে রাখা যাবে না। আর উভয়ের ভেতরের অসন্তোষের বিষয়টি বাইরে প্রকাশ করবে না। কেননা এটা পরিবারিক সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার।

www.amarboi.org

কাজেই সর্বাবস্থায় পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়। এতেও যদি সে ভাল না হয়, তাহলে মৃদু প্রহার করা যেতে পারে। মুখমণ্ডলে আঘাত করা যাবে না, মুখমণ্ডলে প্রহার করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। প্রহারের ক্ষেত্রে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে যে, যেন শরীরে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না হয় বা হাড় ভেঙ্গে না যায়। মনে রাখা উচিত যে, স্ত্রীকে প্রহার করা ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক থেকে অন্যায়। কেননা, এটা একটা নিকৃষ্টতম কাজ। কাজেই প্রহার না করাই উত্তম যদি ধৈর্য ধরে নসীহতের মধ্য দিয়ে বাধ্য ও অনুগত করা যায়। রাসূল (সা) এ সকল নারীদের ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ

فَاِنْ يَّكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلاَتَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتَكَ.

"তার ভেতর সৎপথ অবলম্বনের যোগ্যতা থাকলে সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করবে। সাবধান, তোমার স্ত্রীকে বাঁদী-দাসীর অনুরূপ প্রহার করবে না।" (আবু দাউদ)

স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সংসারে কর্ণধার ও প্রধান পরিচালক হল স্বামী। সব ব্যাপারে স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা স্ত্রীর কর্তব্য। কিন্তু স্বামীকে যদি এ মর্যাদা দিতে স্ত্রী প্রস্তুত না হয় বরং স্বামীর অবাধ্যতা করতে থাকে, স্বামীর প্রবর্তিত পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং যুক্তিসংগত ও শরীয়তসম্মত আদেশ-নিষেধ লংঘন করে তখন সংগত কারণেই স্বামীকে পারিবারিক শৃংখলা রক্ষার্থে স্ত্রীকে শাসন করা জরুরী হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে প্রহার করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা, স্ত্রীকে মারধর করার উদ্দেশ্যে কেউ বিবাহ করে না। কিন্তু স্ত্রী যদি শরী'আতের বিধান লংঘন করে প্রকাশ্য অপরাধ করে তাহলে তাকে সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে কোনভাবেই সীমালংঘন করা যাবে না।

বিদায় হজ্জে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "হে জনতা! শোন, স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদীর মত। তারা প্রকাশ্য

www.amarboi.org

অশ্লীলতা প্রদর্শন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করবে না। যখন তা করবে, তখন তাদের সাথে বিছানার সম্পর্ক ছিন্ন করো। আর তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করতে পার যা ক্ষত সৃষ্টিকারী না হয়। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার পন্থা অবলম্বন করবে না। শুনে নাও, তোমাদের কাছেও তোমাদের স্ত্রীদের কিছু অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের কাছেও তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে। তাদের কাছে তোমাদের অধিকার এটাই যে, তোমরা পছন্দ করো না এমন কাউকে তোমাদের বাড়িতে যেন আসতে না দেয়। আর শুনে নাও, তোমাদের কাছে তাদের প্রাপ্য এবং অধিকার এটাই যে, তোমরা তাদেরকে যথাযথভাবে খোরপোষ প্রদান করবে। (তিরমিযী)

অপর হাদীসে এসেছে, কোন একজন নারীর ভেতরে যদি কোন দিক দিয়ে কোন কিছু অসন্তোষজনক ক্রটি থাকে, তাহলে অন্য অনেক দিক দিয়ে সন্তোষজনকও থাকতে পারে, যদি তাকে সে সময়-সুযোগ দেয়া হয়, তার একটি মাত্র ক্রটির জন্য তার প্রতি চিরস্থায়ী ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা স্বামীর পক্ষে অশোভন।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) لاَيَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً، اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন স্বামীর নিজ মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার একটি অভ্যাস যদি স্বামীর অপছন্দ হয়, তাহলে অন্য একটি অভ্যাস ভাল লাগবে। (মুসলিম)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ আবু দাউদ গ্রন্থের পরিচিতি ৩নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত হাকিম ইবনুল মু'আবিয়া কুশাইরী।

নাম ঃ হাকিম, পিতার নাম ঃ মু'আবিয়া (কুশাইরী)। তিনি ছিলেন পল্লীর অধিবাসী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একজন অন্যতম রাবী ছিলেন।

তাঁর রেওয়ায়াত ঃ হযরত হাকিম ইবনুল মু'আবিয়া কুশাইরী (রা) নিজ

www.amarboi.org

পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে নিজ পুত্র বাহাজ জারিরী (র) হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। (আসমাউর রিজাল)

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব ঃ পারিবারিক জীবনে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেমন কর্তব্য রয়েছে তেমনি স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا "নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর একটি অধিকার রয়েছে।" আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ حَقٌّ عَلَى الْاٰخَرِ.

স্বামী ছাড়া যেমন পরিবারের কথা কল্পনা করা যায় না তেমনি স্ত্রী ছাড়াও একটি আদর্শ ও সুখী সংসারের কথা চিন্তায় আনা যায় না। ইসলামে এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। স্ত্রীর অধিকারসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মোহর পাওয়ার অধিকার ঃ বিবাহের মোহর হচ্ছে স্বামীর কাছে স্ত্রীর ন্যায্য পাওনা। মোহর আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীর উপর ফরয করে দিয়েছেন। 'মোহরানা' অবশ্য-দেয় হিসেবে ধার্য করার এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্য ইসলামে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেনমোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়। তাই বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে এবং বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে। মোহরানা সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন ঃ "মহান আল্লাহ মোহরানাকে বিনিময়স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময়সূচক ও একটা জিনিসের মোকাবেলায় আর একটা জিনিস দানের কারবারের মতই ধরে দিয়েছেন। এটি স্ত্রীর প্রাপ্য হিসাবে স্বামীকে আদায় করতে হয়। (আহকামুল কুরআন ঃ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭)

তবে স্ত্রী খুশি মনে কিছু অংশ ছেড়ে দিলে স্বামী তা ভোগ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

www.amarboi.org

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

"এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের 'মোহ্‌রানা' মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয হিসেবে) আদায় কর। অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশিতে 'মোহ্‌রানার' কোন অংশ মাফ করে দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

২. ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। যাতে করে স্ত্রী স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনাম সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। স্বামী তার স্ত্রীকে সামর্থ্য অনুযায়ী খোর-পোষ প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَآ اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

"যে লোককে অর্থ-সম্পদে স্বাচ্ছন্দ্যে দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবে তার স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয় উৎপাদন স্বল্প পরিমাণ, তার সেভাবেই আল্লাহ্‌র দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের ওপরই তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।" (সূরা আত-তালাক ঃ ৭)

রাসূল (সা) স্ত্রীর খোর-পোষের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

"স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।" (তিরমিযী)

"যখন তোমরা খাবে তখন তাদেরকে (স্ত্রীদের) খাওয়াবে আর যখন তোমরা পোশাক পরবে তখন তাদেরকে পোশাক পরাবে। (আবু দাউদ)

৩. ক্ষমা পাওয়ার অধিকার ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ব্যাপারে মনোমালিন্য

www.amarboi.org

হতে পারে। এ সুযোগে শয়তান পরস্পরের মধ্যে নানা প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় রত থাকে। ফলে অতি সামান্য ব্যাপারেও পারস্পরিক সুসম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে। এ অনাকাংখিত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতে হবে। অল্পতেই রেগে যাওয়া অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া ও স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে স্বামী অথবা স্ত্রী বেসামাল হয়ে গেলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। স্বামীর কাছে স্ত্রীর ক্ষমা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ও ভালভাবে বসবাস করবে। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এও হতে পারে যে, তোমরা একটি বস্তুকে অপছন্দ কর অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এর মধ্যে বিপুল কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

৪. সদয় ব্যবহার পাওয়ার অধিকার ঃ স্বামীর কাছে স্ত্রীর সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে একত্রে বসবাস করা এবং সদ্ব্যবহার পাওয়া। কোন অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করতে পারবে না। দোষে-গুণে মানুষ। স্ত্রী যদি কোন ভুল করে, অন্যায় করে তবুও তার ওপর যুল্ম-অত্যাচার করা চলবে না। মারধর করা যাবে না। সর্বদা মধুর ব্যবহার করবে। স্বামী-স্ত্রীর মধুর ব্যবহারে সংসার সুখের ও মধুময় হয়।

وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ، وَلاَ تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا.

"শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য তাদেরকে আটকিয়ে রেখোনা। কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে। আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃত পক্ষে নিজের উপরই যুল্ম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেলতামাসার বস্তু বানিওনা। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩১)

৫. স্ত্রীর পর্দায় থাকার অধিকার ঃ স্বামীর ওপর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে সর্বদা

www.amarboi.org

পর্দায় রাখা এবং স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার হাত থেকে রক্ষা করা। পরিবারে শরয়ী পর্দার পরিবেশ সৃষ্টি করা স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে অবহেলা করা হলে পরিবারে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

"তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬)

৬. **ইজ্জতের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার ঃ** স্ত্রীর সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা স্বামীর দায়িত্ব। কোন প্রকারেই স্ত্রীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। তাকে প্রহার করতে পারবে না। গাল-মন্দ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকে সসম্মানে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে সার্বিক নিরাপত্তা দিতে হবে। কোন প্রকার ভয়-ভীতি দ্বারা তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। স্ত্রীকে তো খুশীর সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই তার ওপর ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতঃ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা শরীয়ত বিরোধী কাজ।

৭. **বিপদে সহানুভূতি পাওয়ার অধিকার ঃ** স্ত্রীর বিপদে-আপদে ও রোগে-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। বস্তুতঃ স্ত্রী বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে-শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন কোন রোগ হয় তখন স্বামীর মন যদি তার জন্য দ্রবীভূত না হয়ে মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন অবধি থাকে না। এজন্য নবী করীম (সা) স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেন ঃ

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ.

"যে লোক অপরের প্রতি দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না। (রিয়াদুস সালেহীন)

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এজন্য স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য। (পরিবার ও পারিবারিক জীবন ঃ ১৮৪)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একান্ত আপনজন। সুখ-দুঃখের সহযাত্রী। উভয়ের মধ্যে খুব বেশী আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা থাকতে হবে। একে অপরকে অধিক ভালবাসবে। দুঃখ-বেদনায় একে অপরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। মহানবী (সা) বলেছেনে ঃ "তোমাদের মধ্যে তারাই অতি উত্তম যারা নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করে সানন্দে জীবন যাপন করে। কেননা, আমি স্বয়ং নিজেও আমার স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করি ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করি।"

৮. সমমানের জীবন যাপনের অধিকার ঃ বসবাসের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর সমান অধিকার রয়েছে। স্বামীর নিজের সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীকে নিয়ে একই সাথে বসবাস করবে। স্ত্রীকে পৃথকভাবে বসবাস করতে দিবে না। তা ইসলামের রীতি নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلَاتُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ.

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী যে স্থানে বাস করো তাদেরও সে স্থানে বসবাস করতে দাও। আর কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উত্যক্ত করো না।" (সূরা আত-তালাক ঃ ৬)

৯. স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা ঃ স্বামীর ওপর স্ত্রীর অপর একটি অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আপনজন। দু'জনের মধ্যে অনেক গোপন কথা হতে পারে। পরস্পর পরস্পরের গোপনীয়তা রক্ষা করবে। যদি স্বামী স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা না করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে লজ্জিত হবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং স্ত্রী তার নিকট গমন করে। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যের নিকট প্রকাশ করে। (মুসলিম)

www.amarboi.org

যে সকল নারী-পুরুষ নিজেদের গোপন কথা প্রকাশ করে তাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে নবী করীম (সা) বলেন ঃ "সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করল, অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলো। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

১০. স্ত্রীর পরামর্শ দেয়ার অধিকার ঃ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ করলে এটা দাম্পত্য জীবনে মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এতে ভালবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সহজে এবং অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। পবিত্র কুরআনে সকল কাজে যেমন পরামর্শের তাকিদ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে পরামর্শের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

"স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)

শিক্ষা

১. স্ত্রীকে তাই আহার করাবে যা নিজে আহার করবে।

২. স্ত্রীকে সে পোশাক পরিধান করাবে যা নিজে পরিধান করবে।

৩. স্ত্রীকে প্রহার করবে না।

৪. বিশেষ করে স্ত্রীর মুখমণ্ডলে কখনো প্রহার করবে না।

৫. স্ত্রীকে কখনো অশ্লীল ভাষায় গালি দেবে না।

৬. স্ত্রীর সাথে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাকে ঘরে রেখেই তা করবে।

৭. আমাদের সকলেরই উচিত স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

www.amarboi.org

দারস-৮

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰـهِ (صلعم) مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. (اِبْنِ مَاجَهْ)

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কি হক আছে? তিনি বললেন ঃ তারা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (ইবনে মাজা)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। اَنَّ رَجُلاً قَالَ ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বললেন। يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা)। مَا حَقُّ ঃ কি হক আছে? اَلْوَالِدَيْنِ ঃ মাতা-পিতার। عَلٰى وَلَدِهِمَا ঃ তাদের সন্তানের ওপর। قَالَ ঃ তিনি বললেন। هُمَا ঃ তারা দু'জন। جَنَّتُكَ ঃ তোমার বেহেশত। وَنَارُكَ ঃ এবং তোমার দোযখ।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানের নিকট পিতা-মাতার স্থান অতি উর্ধ্বে। পিতা-মাতার তুল্য আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নাই। তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য হাদীসখানায় পিতা-মাতার আদব সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। যারাই পিতা-মাতাকে মান্য করে চলবে তাঁরাই জান্নাতের অধিকারী হবেন। আর যারা পিতা-মাতার অবাধ্যচারী হবে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ

"পিতা-মাতার অবাধ্যচারীকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।" (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদেরকে

www.amarboi.org

পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, আল্লাহর শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ হলো "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" (কুরতুবী)

অতএব পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্ন সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বে-আদবী ও তাদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

পিতা-মাথা সন্তানের সর্বাপেক্ষা আপনজন ও পরমাত্মীয়। তারা অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও অফুরন্ত ভালবাসা আর আদর-যত্নে সন্তানকে লালন-পালন করে থাকেন। পিতা-মাতা সন্তানদের বড় করার স্বপ্নে একরাশ আশা বুকে নিয়ে হাসি মুখে বরণ করে নেন সকল দুঃখ-কষ্ট। তাই তাদের ঋণ পরিশোধ করা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সবচেয়ে বেশী।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ ইবনে মাজাহ।

আলোচ্য হাদীসখানা ইবনে মাজাহ্ শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হল। সুনান ইবনে মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তার ষষ্ঠতম গ্রন্থ। ইমাম ইবনে মাজাহ্ অপরিসীম সাধনা করে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর নাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ। তিনি ২০৯ হিজরীতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হাদীস চর্চার অন্যতম কেন্দ্রস্থল কাজভীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (মু'জামুল বুলদান, পৃঃ ৮২)

তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মক্কা, মদীনা, মিশর, সিরিয়া ও নিশাপুরসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং এর থেকে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীসের এ

www.amarboi.org

অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যার মধ্যে ৩২টি পরিচ্ছেদ ও পনেরশত অধ্যায় আছে। হাফিয ইবনে হাজার (র) বলেন ঃ "ইহা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ গ্রন্থ, ফিকাহর দৃষ্টিতে উহার অধ্যায়সমূহ খুবই সুন্দর ও মজবুত করে সাজানো হয়েছে।" হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন ঃ "ইমাম ইবনে হাজার সুনান কিতাবখানা অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস সম্বলিত এবং উত্তম। এ মহামনীষী ২৭৩ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। (তাহযীবুত তাহযীব)

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু উমামা (রা)।

নাম ঃ সা'দ, উপনাম ঃ আবু উমামা, পিতার নাম ঃ সাহল।

তিনি আবু উমামা উপনামে সমধিক পরিচিত। তাঁর নানার নাম ছিল সা'দ ইবনে যুরারা এবং উপনাম ছিল আবু উমামা। রাসূল (সা) তাঁর নানার নাম ও উপনাম অনুসারে তাঁর নাম রেখেছেন সা'দ এবং উপনাম রেখেছেন আবু উমামা। তিনি আউস গোত্রীয় একজন অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতা সাহল (রা) ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহাবী। রাসূল (সা)-এর ওফাতের ২ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তাঁর বয়স কম থাকার কারণে রাসূল (সা) হতে কিছু শুনতে পারেননি। তিনি স্বীয় পিতা সাহল (রা) এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট হতে বহু সংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরী এক'শ সনে ৯২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। (আসমাউর রিজাল)

নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

১. **সদ্ব্যবহার ঃ** পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের প্রধান দায়িত্ব। সর্বাবস্থায় তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

www.amarboi.org

"আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি আপন পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৮)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا.

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি আপন পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য।" (সূরা আল-আহ্‌কাফ ঃ ১৫)

২. নিরাপত্তা বিধান ঃ পিতা-মাতার সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা সন্তানের প্রধান দায়িত্ব। বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে যখন পিতা-মাতা চলা-ফেরা করতে অক্ষম হন, তখন তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয়া একান্ত কর্তব্য। আচার আচরণে তাঁরা যেন কোন ধরনের আঘাত না পান সে দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ط وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ط رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়ে তোমাদের নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তুমি তাদের প্রতি 'উহ্' কথাটিও উচ্চারণ করো না। তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলো। দয়া ও বাৎসল্য সহকারে তাদের প্রতি স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করো। আর বলো, হে আমার প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি তেমনি সদয় হও যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে স্নেহ-মমতা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৫)

www.amarboi.org

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছর যাবত দুধ পান করিয়েছে। অতএব তুমি আমার এবং আপন পিতা-মাতার শোকরিয়া আদায় করো।" (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

৩. সেবা যত্ন করা ঃ পিতা-মাতার সেবা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। তাঁরা অসুস্থ হলে তাঁদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সেবা-যত্নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি যাতে না ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একখানা হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ এক লোক রাসূলের নিকট এসে তাঁর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন?" সে জবাব দিল ঃ জি হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন ঃ তাহলে তাঁদের সেবা-যত্নের জিহাদে ব্রতী হও।" (বুখারী)

অপর এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে সেবা-যত্নকারী সন্তান পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মাকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ সে যদি দিনে একশত বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, একশত বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এ সাওয়াব পেতে থাকবে। (বায়হাকী)

৪. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঃ সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার দানের কথা বলে শেষ করা যায় না। মাতা অতি কষ্টে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে নিজের

www.amarboi.org

শরীরের রক্ত বিন্দু দ্বারা সন্তানকে দিনে দিনে বড় করে তোলেন। মাতৃগর্ভ সন্তানের প্রথম আশ্রয়স্থল। মা শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে হাসি মুখে বরণ করে নেন সকল দুঃখ-কষ্ট। এই সময়ের সীমাহীন কষ্টের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا.

"আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করে। তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ত্যাগ করানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস সময় লেগেছে।" (সূরা আল-আহক্বাফ ঃ ১৫)

পিতাও সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করেন। পিতা-মাতার এসব ত্যাগ ও দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

৫. সম্পর্ক বজায় রাখা ঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। পারিবারিক জীবনে তাঁদের সকল হক ও অধিকার যথারীতি আদায় করতে হবে। সকল আলেম ও ফিকাহবিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য করা শুধুমাত্র বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহের কাজে আনুগত্য করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَاطَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীমূলক কাজে কোন সৃষ্ট জীবের আনুগত্য করা জায়েয নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.

www.amarboi.org

"আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়া-পীড়ি করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৮)

তবে পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও জাগতিক জীবনে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জরুরী। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

"কিন্তু জাগতিক জীবনে তাঁদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখ।" (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

৬. ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ঃ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার সার্বিক দায়িত্ব সন্তানের। পিতা-মাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। তাদের জন্য প্রয়োজনমত আর্থিক সহযোগিতা প্রদান সাধ্যমত নিশ্চিত করতে হবে। ওয়াজিব দান ব্যতীত সন্তানের সকল ধরনের দানে পিতা-মাতাকে স্মরণে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ.

"হে রাসূল আপনি বলে দিন, তোমরা যা কিছু আর্থিক দান করে থাক তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয়ের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৫)

৭. অবাধ্য না হওয়া ঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সন্তানের কখনোই তাঁদের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ্। তাওবা করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহ্ ক্ষমা করেন না। এ প্রসঙ্গে নবী (সা) বলেন ঃ

كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَا شَاءَ اِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

"আল্লাহ সকল গুনাহ তাঁর ইচ্ছামত ক্ষমা করে থাকেন কিন্তু মাতা-পিতার

www.amarboi.org

অবাধ্যতার গুনাহ ক্ষমা করেন না বরং এ গুনাহগারকে পার্থিব জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।" (হাকেম)

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

"পিতা-মাতার অবাধ্যচারী সন্তান, উপকার করে খোটা দানকারী এবং মদ্য পানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

৮. জান্নাত লাভের উপায় ঃ দুনিয়ার জীবনে শান্তি এবং পরকালে জান্নাতে অফুরন্ত নি'আমত ভোগ করতে হলে অবশ্যই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ওপরই আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

"মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।" (তিরমিযী)

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

" জননীর পদ তলে সন্তানের বেহেশ্ত।" (ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী)

অবাধ্য সন্তানের দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা) বলেন ঃ

"তার নাক ধুলিমলিন হোক" এ কথাটি তিন বার বললেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোন একজনকে কিংবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করেনি।" (মুসলিম)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যাবে; আর তাদের অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। যেমন অপর একটি হাদীসের একাংশে বলা হয়েছে ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

www.amarboi.org

"পিতা-মাতাই তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।" (ইবনে মাজাহ)

৯. সাহচর্য দান ঃ পিতা-মাতাকে সাহচর্য দান করা সন্তানের কর্তব্য। বার্ধক্য অবস্থায় অসহায় পিতা-মাতার সাহচর্যে থাকা জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়েও উত্তম কাজ। এ প্রসঙ্গে হযরত জাহেমা (রা)-এর ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট হাজির হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমার মা আছেন কি? জাহেমা (রা) জবাব দিলেন, জি হ্যাঁ। মহানবী (সা) বললেন ঃ মায়ের নিকট থাক (তাঁর খেদমত করো)। কেননা, বেহেশত মায়ের পায়ের কাছে।"

১০. ঋণ পরিশোধ করা ঃ পিতা-মাতা ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করতে অপারগ হলে সন্তানের তা পরিশোধ করে দেয়া কর্তব্য। বিশেষ করে মৃত্যুর পরে তাঁদের গ্রহীত ঋণ পরিশোধ করা, অসিয়াত পূর্ণ করা ও পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন ঃ "পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে।"

১১. মাগফিরাত কামনা করা ঃ জীবিত অবস্থায় যেমন পিতা-মাতার প্রতি সীমাহীন দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তেমনি মৃত্যুর পরেও সারা জীবন ব্যাপী পিতা-মাতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা ও আল্লাহর দরবারে দু'আ করা সন্তানের পবিত্র দায়িত্ব। তাদের রুহের মাগফেরাত কামনায় সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার শিখানো এ দু'আ পড়তে হবে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

"হে প্রভু! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

www.amarboi.org

"হে প্রভু! হিসাব নিকাশের দিন তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদারদেরকে ক্ষমা করে দাও।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪১)

শিক্ষা

১. পিতামাতা আমাদের অতি আপনজন।

২. তাঁদের খেদমতে বেহেশত আর অবাধ্যতায় দোযখ।

৩. তাঁদের হক আদায় করে খেদমত করতে হবে।

৪. তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৫. মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-৯

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ـ اَلايَة. (مسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে সন্তানই জন্মগ্রহণ করে তার জন্ম হয় স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ও ভাবধারার ভিত্তিতে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বানায়, বানায় খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক। এটা ঠিক তেমন যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ, সুগঠিত দেহ সম্পন্ন বাছুর প্রসব করে। তোমরা তার মধ্যে কোন কান কাটা (অঙ্গহানি) দেখতে পাও কি ? (বরং প্রসবের পর মানুষ তার কান কেটে নাক ছিদ্র করে বিকলাংগ করে দেয়) অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে কুরআনের এই আয়াতটি পড় ঃ "আল্লাহর স্বভাবসিদ্ধ সৃষ্টি ব্যবস্থা ও ভাবধারা, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন (তার উপর তোমরা ঠিক থাকবে)। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন রূপ পরিবর্তন নেই। (মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ঃ নিশ্চয়ই তিনি বলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা) বলেছেন। مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ ঃ যে সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى

www.amarboi.org

الْفِطْـرَةُ ঃ তার জন্ম হয় স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ও ভাবধারার ভিত্তিতে। فَأَبَوَاهُ ঃ অতঃপর তার পিতামাতা। يُهَوِّدَانِهِ ঃ তাকে বানায় ইহুদী। وَيُنَصِّرَانِهِ ঃ তাকে বানায় খৃষ্টান। وَيُمَجِّسَانِهِ ঃ তাকে বানায় অগ্নিপূজক। كَمَا تُنْتَجُ ঃ যেভাবে প্রসব করে। الْبَهِيْمَـةُ ঃ চতুষ্পদ জন্তু। بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ ঃ পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত দেহ সম্পন্ন বাছুর। هَلْ ঃ কি? تُحِسُّوْنَ ঃ তোমরা দেখতে পাও। فِيْـهَا ঃ এর মধ্যে। مِنْ جَدْعَاءَ ঃ কোন কান কাটা। ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন। اِقْرَؤُا ঃ তোমরা পড়। اِنْ شِـئْتُمْ ঃ তোমাদের ইচ্ছা হলে। فِطْرَةَ اللهِ ঃ আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থা ও ভাবধারা। اَلَّتِـىْ ঃ যার। فَطَرَ النَّاسَ ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। عَلَيْهَا ঃ যার উপর ভিত্তি করে। لاَ تَبْدِيْلَ ঃ কোন রূপ পরিবর্তন নেই। لِخَلْقِ اللهِ ঃ আল্লাহর সৃষ্টিতে।

ব্যাখ্যা ঃ মানব সন্তানের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসখানায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশু-সন্তান আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী নিয়মে ও স্বভাবজাত ভাবধারায়ই জন্মগ্রহণ করে থাকে। শিশু জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতারই দায়িত্ব ও কর্তব্য হয় তারা এ শিশুকে কিভাবে গড়ে তুলবে। তাঁরা যেভাবে গড়ে তুলতে যত্নবান হবেন শিশু-সন্তান সেভাবেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব কতটুকু একথা বুঝাবার জন্যই রাসূল (সা) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমাদের চারপাশে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার যে বাছুর প্রসব করে তা সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাতে কোন অঙ্গহানি দেখা যায় না। হাত পা নাক কানে কোন কাটা-ছেড়া লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ খুঁতমুক্ত ও ত্রুটিহীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ ঐ সব প্রাণীকে অঙ্গহানি করে। কোনটার নাক ছিদ্র করে, কোনটার কান কেটে দেয় ও কোনটার জিহ্বায় দাগ দেয় অর্থাৎ অঙ্গহানি করে। মানব সন্তানও সেভাবে আদর্শিকভাবে ও ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে অনুরূপ নিখুঁত ও ত্রুটিহীন অবস্থায় ইসলমের আদর্শের উপর জন্ম নেয়। কিন্তু পিতা-মাতার আদর্শ ও ধর্ম বিশ্বাসে

www.amarboi.org

প্রভাবিত হয়েই সাধারণতঃ সন্তানেরা তা গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়। দীনি পরিবেশে দীনি আদর্শে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সন্তান সত্য দীন থেকে দূরে সরে যায় এবং দীনের দুশমন হয়। তাই শিশুদের উত্তম চরিত্র গঠনে ইসলামী জীবন ধারার অনুসারী বানাতে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেয়া হয়েছে।

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. আযান ও ইকামত দান ঃ মুসলিম পরিবারে যখন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তখন সর্বপ্রথম তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিতে হবে। সদ্যজাত শিশু সন্তানের প্রতি শয়তান প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে কুমন্ত্রণা দিতে চায়। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এ বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়। (কুরতুবী)

আযান ও ইকামতের ধ্বনি শুনতে পেলে শয়তান দ্রুত পলায়ন করে। আর সে সন্তানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। এছাড়াও দুনিয়ার বিচিত্রময় ধ্বনি থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলামের মূল বিধানের প্রতি আহ্বানের ধ্বনিই শিশুর কানে ধ্বনিত হওয়া ঈমানের দাবী। রাসূল (সা) বলেন ঃ যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তার উচিত সন্তানের ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামতের শব্দাবলী উচ্চারণ করা। এরূপ করা হলে প্রাকৃতিক কোন ক্ষতিকর প্রভাব তার প্রতি পতিত হবে না। (বায়হাকী)

এ প্রসঙ্গে অপর একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ "হযরত আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে হযরত আলী ইবনে

www.amarboi.org

আবু তালিবের পুত্র হাসানের কানে নামাযের আযান দিতে দেখেছি; যখন নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা) তাকে প্রসব করেছিলেন। (তিরমিযী)

২. ভাল নাম রাখা ঃ সন্তান জন্মের পর পরই ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত নাম রাখা পিতার কর্তব্য। মহানবী (সা) নিজের উম্মতকে ভাল নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

"কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব ভাল নাম রাখ।"

নামে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। ভাল নাম সকলের নিকটই পছন্দনীয়। কেউ বিশ্রী এবং খারাপ নাম পছন্দ করে না। এজন্য ইসলামী আকীদা এবং আদর্শের পরিপন্থী কোন নাম রাখা উচিত নয়, ভাল, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা উচিত। সন্তান জন্মের পর কালবিলম্ব না করে নাম রাখা একান্ত কর্তব্য। অবশ্য সপ্তম দিন পর্যন্ত নামকরণ বিলম্ব করার সুযোগ রয়েছে।

৩. তাহনীক ও খাতনা করা ঃ সন্তান জন্মের পর তাকে মিষ্টিমুখ করাকে হাদীসে তাহনীক বলা হয়েছে। খেজুর মুখে চিবায়ে নরম করে সদ্যজাত শিশুর মুখের ভিতরে উপরে তালুতে লাগায়ে দেয়াকে "তাহনীক" বলা হয়। মহিলা সাহাবীগণ সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান নবী করীম (সা)-এর নিকট এনে তাঁর কোলে তুলে দিতেন। নবী করীম (সা) নবজাতকদের কোলে নিয়ে আদর করতেন এবং খেজুর চিবায়ে মুখে মিষ্টি রস দিতেন ও সুন্দর নাম রাখতেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করতেন।

পুত্র সন্তানের পুরুষাংগের অগ্রভাগের বর্ধিত চর্ম কর্তন করাকে খাতনা বলা হয়। খাতনা করা সকল নবীর সম্মিলিত সুন্নাত। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি কাজ স্বভাবসম্মত। তা হলো ঃ

(১) খাতনা করা (২) নাভির নীচে ক্ষুর ব্যবহার করা (৩) মোচ কাটা (৪) নখ কাটা (৫) বগলের পশম উপড়ানো। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ ঃ সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং তাকে প্রতিপালনের আবেগ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মাতা-পিতা দু'জনেই

www.amarboi.org

সমভাবে সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর সন্তান প্রতিপালনের জন্য দু'ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

প্রথমতঃ সন্তানের যত্ন নেয়া;

দ্বিতীয়তঃ সন্তানের ব্যয়ভার বহন করা।

প্রথমতঃ মানব সন্তান অসহায়ভাবে জন্মগ্রহণ করে। আদর-যত্ন করে, প্রতিপালন করে তাকে বড় করতে হয়। এক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার ভূমিকাই অধিক। সর্বদা শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা; শিশুর প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাদের তত্ত্বাবধায়ন করা ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা। যে পর্যন্ত খানা-পিনা গ্রহণ করার উপযোগী না হবে সে পর্যন্ত তাকে বুকের দুধ পান করানো উচিত। কেননা মায়ের দুধে সন্তানের দৈহিক গঠনের সাথে সাথে শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে।

দ্বিতীয়তঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করা পিতার দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'আলা পিতার অন্তরে পিতৃত্বসুলভ ভালবাসার সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি করে তার এবং তার সন্তানের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। এ স্বভাবজাত হৃদ্যতার কারণে পিতা অত্যন্ত উদারতার সাথে গায়ের ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের জন্য অকাতরে সকল কিছু নির্দ্বিধায় খরচ করে যায়। আর এতে তিনি বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালের সাওয়াব পাওয়ার লক্ষ্যে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে, তার এ ব্যয় সাদকাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তিনি গুনাহগার হবেন। মহানবী (সা) বলেন ঃ

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبَسَ عَمَّنْ تَمْلِكَ قُوْتَهُ.

www.amarboi.org

"যাদের খাওয়া পরার দায়িত্ব একজনের হাতে থাকে সে যদি তা বন্ধ করে দেয় তবে একাজই তার বড় গুনাহ্ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (মুসলিম)

৫. আকিকাহ্ করা ঃ সন্তান জন্মের সপ্তম তারিখে আকিকা করা মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ "প্রত্যেক সদ্যজাত শিশু সন্তান তার আকিকার সাথে বন্দী। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু যবাই করবে। তার নাম রাখবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডন করবে।" (বুখারী, তিরমিযী)

রাসূল (সা) তাঁর দৌহিত্র হাসানের নামে আকিকা করলেন এবং বললেন ঃ "হে ফাতিমা! ওর (হাসানের) মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং তার মাথার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সাদকা করে দাও।"

"শিশু অবস্থায় যে সন্তান আকীকা ব্যতীত মারা যায় কিয়ামতের দিন সে তার মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করবে না।" (ইমাম আহমদ)

অভিভাবক যদি আকীকা না করে থাকে তাহলে নিজের আকীকা নিজেই করবে। মহানবী (সা) নবুওয়ত প্রাপ্তির পর নিজের আকীকা নিজেই করেছিলেন।

আকীকার নিয়ম প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ "ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবাই করা যথেষ্ট।"

৬. স্নেহ ও ভালবাসা দান ঃ স্নেহ-ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে স্বভাবগত ভাবে স্নেহ ও ভালবাসা দান করেছেন। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ভালবাসা মানুষের জন্য রমণীয় করে দেয়া হয়েছে। তিনি পিতা-মাতার অন্তরে সীমাহীন ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এ ভালবাসা অকৃত্রিম ও চিরন্তন। পিতা-মাতার মায়া-মমতা ও আদর-যত্ন পাওয়া সন্তানের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে সন্তানদের বঞ্চিত করা কোনভাবেই উচিত নয়। এ অধিকার থেকে সন্তানেরা বঞ্চিত হলে তারা কিছুতেই পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

"যে অপরের প্রতি দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামের নবী মানুষের প্রতি দয়া দেখাতেন এবং উম্মতকে অপরের প্রতি স্নেহ-দয়া দেখাবার নির্দেশ দিয়েছেন। স্নেহ ও দয়া-মায়ার জালেই মানব সমাজ আবদ্ধ। বড়রা ছোটদেরকে স্নেহ করবে আর ছোটরা বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে– এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ জন্যই মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "যে বড়কে সম্মান করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিশেষ করে তিনি শিশুদেরকে সোহাগ করে কোলে নিতেন। হযরত উসমান বিন যায়েদ (রা) বলেছেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে কোলে নিয়ে এক উরুর উপর অপর উরুর উপর হযরত হাসান (রা)-কে বসাতেন এবং আমাদের দু'জনকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলতেন হে আল্লাহ! এ দু'জনের উপর রহম করো। আমি তাদের উপর দয়া দেখিয়ে থাকি। (বুখারী)

৭. সুন্দর আচরণ করা ঃ সন্তান মাতা-পিতার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার এক বড় নি'আমত ও আমানত। এদের হিফাজতের দায়িত্ব মাতা-পিতার উপর অর্পণ করেছেন। সন্তানের সাথে ভাল আচরণ করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলা-মেশা করা, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা এবং তারা যাতে হাসি-খুশিতে সময় কাটাতে পারে তার প্রতি নজর রাখা উচিত। তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন কোন ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তাদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যাতে করে দুনিয়ায় তারা বড় হয়ে পিতা-মাতার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং পরকালেও তাদের নাযাতের উসিলা হয়। মাতা-পিতা যদি সত্যিকার অর্থে সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হয় তাহলে তাদের হক আদায় করতে হবে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাহলেই তাদের কাছ থেকে ভাল আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে। তাহলেই কেবল আপনি তাদের থেকে

www.amarboi.org

ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ পেতে পারেন। যেমন দুনিয়ায় আপনার সকল প্রয়োজন পূরণ করবে ও সম্মান করবে। মৃত্যুর পর আপনার জন্য দু'আ করবে। আর এটাই হবে সাদকায়ে জারিয়া। সন্তানের সাথে যদি মাতা-পিতার আচরণ ভাল না হয়, তারা যদি সন্তানদের স্নেহ, সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ক্রোধান্বিত ভাব প্রকাশ করে তাহলে সন্তানরা নিরাশ হয়ে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। তাই সন্তানের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে সহনশীল আচরণ করা একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা তাগাবুন ঃ১৪)

৮. নিরাপত্তা বিধান করা ঃ সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নি'আমত। তাই সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা, রোগমুক্ত রাখা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)

৯. শিক্ষা দান ঃ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ সভ্য হতে পারে না। শিক্ষা গ্রহণের পাশা-পাশি নিজের কাজে কর্মে ও চলা-ফেরায় শিক্ষার প্রতিফলন না থাকলে সে শিক্ষাও মূল্যহীন। তাই সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, সুন্দর আচরণ শিক্ষা দেয়া এবং ভাল কাজে অভ্যস্ত করে তোলা মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ "তোমরা নিজেরা জ্ঞান ও কল্যাণকর রীতি শিক্ষা কর, পরিবার পরিজনকে শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে ভাল কাজে অভ্যস্ত করে তোল।" প্রিয় নবী (সা) সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দানের তাকিদ দিয়ে বলেন ঃ

مَانَحِلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

www.amarboi.org

"পিতা নিজের সন্তানকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান হলো উত্তম শিষ্টাচার (আদব-কায়দা)।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

১০. দীনের পথে পরিচালনা ঃ সন্তানদের উত্তমরূপে লালন-পালনের সাথে সাথে তাদেরকে দীনের পথে পরিচালনা করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব মাতা-পিতার। তাই শৈশবকাল থেকেই নামায রোযাসহ সকল ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা দীনের পথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত করে। দীনি জিন্দেগী অতিবাহিত করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। আল্লাহর দীনের হিফাযত এবং দীনি আন্দোলনে লোক তৈরীর এক বড় প্রশিক্ষণ হচ্ছে এই নামায। এর গুরুত্ব তুলে ধরে মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْاهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার আদেশ কর যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌঁছবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন (কঠোরতা) কর যখন তাদের বয়স দশ বছরে উপনীত হয়। আর তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

১১. সন্তানের মধ্যে সমতা বিধান ঃ পিতা-মাতার নিকট সকল সন্তানই আপন, তাই তাদের মধ্যে সমান আচরণ করা উচিত। সন্তানদের মধ্যে সমান ব্যবহার করা না হলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। বঞ্চিত সন্তানদের মনে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোন মানুষের পক্ষে সকল সন্তানের প্রতি একই ধরনের ভালবাসা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ এটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। স্বভাবগত কারণেই কখনো কখনো কোন কোন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা ও আকর্ষণ বেশী কম হতে পারে। কিন্তু আচরণের ক্ষেত্রে সকলের সাথে সমান হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

www.amarboi.org

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো।" (মুসনাদে আহমদ)

সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ না করা বড় অন্যায় ও চরম যুল্‌ম। তাদের মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেয়া হলে অপরজনের অধিকার অবশ্যই ক্ষুণ্ন করা হবে। কেউ কেউ পুত্র সন্তানের সাথে ভালো আচরণ করে থাকেন কিন্তু কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সে রকম আচরণ করা হয় না এটা বড় অন্যায়। কোন মুসলমান পিতা-মাতা পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেয়ার চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত পাওয়ার পন্থা হলো পুত্র ও কন্যার সাথে সমান আচরণ করা। হাদীসে এসেছে, যে পিতা-মাতার মধ্যে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে তাকে পরকালে জান্নাত দান করা হবে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমতঃ কন্যাকে জীবিত দাফন না করা এবং বাঁচার অধিকার প্রদান করা।

দ্বিতীয়তঃ কন্যাকে বে-ইজ্জতী ও অপদস্ত না করা।

তৃতীয়তঃ পুত্রকে কন্যার উপর প্রধান্য না দেয়া।

এছাড়াও অপর একটি হাদীসে এসেছে ঃ "তোমাদের কারো তিনটি কন্যা বা তিনটি ভগ্নি থাকলে ও তাদের কল্যাণ সাধন (উত্তমভাবে লালন-পালন শিক্ষা দীক্ষা ও ভাল আচরণ) করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

১২. বিলাসী করে না তোলা ঃ পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবারের কর্তাকে অবশ্যই মিতব্যয়ী হতে হবে। বিশেষ করে সন্তানদের ক্ষেত্রে খরচ করতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকলেও সন্তানদেরকে বিলাসী করে গড়ে তোলা উচিত নয়। অনেক পিতাই এদিকে নজর না দিয়ে বিলাসী করে তুলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিজনকে বিলাসী করে গড়ে তোলা অথবা কার্পণ্য করে

www.amarboi.org

পারিবারিক দায়িত্ব অবজ্ঞা করা উভয় দিকই নিন্দনীয়। সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"আল্লাহর সৎ বান্দা তারা যারা (পারিবারিক ক্ষেত্রে) যখন অর্থ ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং মধ্যপন্থায় দৃঢ় থাকে।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৭)

১৩. বিবাহের ব্যবস্থা করা ঃ সন্তান যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হবে তখন তাকে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে বিয়ে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। সন্তান যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার মনে নতুন ধরনের চিন্তা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। যদি উপযুক্ত বয়সে সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয় অথবা শরয়ী ও যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়া বিলম্ব করা হয় তখন সন্তানেরা যৌবনের আবেগ বা উত্তেজনা প্রশমনের সঠিক ও বৈধ সুযোগ না পেয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা গুনাহের জন্য দায়ী হবেন। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ.

"যখন সন্তান বয়োঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে বিয়ে দেবে। আর যদি বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে না দেয়া হয় তখন যদি সে গুনাহের কাজ করে বসে তাহলে সে গুনাহের জন্য পিতা দায়ী হবেন।" (বায়হাকী)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) অপর আর এক হাদীসে বলেন ঃ "আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো তার ভাল নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন বিয়ে দিয়ে দেয়া। বালেগ হবার পর যদি সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং কোন গুনাহতে লিপ্ত হয়, তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।" (তিরমিযী)

১৪. আল্লাহর দরবারে দু'আ করা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে

www.amarboi.org

সন্তানের কল্যাণের জন্য দু'আ করা একান্ত কর্তব্য। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল হয়।

প্রথমতঃ পথচারীর দু'আ;

দ্বিতীয়তঃ পিতা-মাতার দু'আ;

তৃতীয়তঃ মাযলুমের অর্থাৎ যার উপর অত্যাচার করা হয়, তার দু'আ।

কখনোই সন্তানের প্রতি বদ-দু'আ করা বা অভিশাপ দেয়া জায়েয নেই। পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। এতে সন্তানের অকল্যাণ হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

وَلاَتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَتَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَتَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ.

"আর তোমরা নিজেদের উপর বদ-দু'আ করো না, তোমরা সন্তানের উপর বদ-দু'আ করো না এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদের উপর বদ-দু'আ করো না।" (মুসলিম)

সন্তানের আচার-আচরণে, কথাবার্তায় ও চাল-চলনে যাতে পিতা-মাতার মনে প্রশান্তি লাভ করতে পারে তার জন্য সদা-সর্বদা নিম্নের দু'আ করা একান্ত কর্তব্য।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা আমাদের নয়নে তৃপ্তিদান করে। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (নেতা) বানাও।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭৪)

শিক্ষা

১. শিশু সন্তান জন্ম হয় ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার ভিত্তিতে।

২. পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।

৩. শিশু বড় হয়ে কি হবে তা তার পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল।

৪. শিশুকে যে আদর্শের ভিত্তিতে গড়বে সেভাবেই সে বড় হবে।

৫. আমাদের উচিৎ সন্তানদেরকে দীনি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

www.amarboi.org

দারস-১০

শ্রমিকের অধিকার

عَنْ اَبِىْ هَرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ (صلعـم) اِخْوَانُكُـمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰـهُ اَخَـاهُ تَحْـتَ يَدَيْـهِ فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَيُكَلِّفُهُ مِـنَ الْعَمَـلِ مَـا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (بخارى، مسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজ যেন তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য। (বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। قَـالَ ঃ তিনি বলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা) বলেছেন। اِخْوَانُكُـمْ ঃ তোমাদের ভাই। جَعَلَهُمُ اللّٰهُ ঃ তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন। تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ ঃ তোমাদের অধীনস্থ। فَمَنْ ঃ যে ব্যক্তি, যাকে। جَعَلَ اللّٰـهُ ঃ আল্লাহ করে দিয়েছেন। اَخَـاهُ ঃ তার ভাইকে। تَحْـتَ يَدَيْـهِ ঃ যার অধীন করেছেন। فَلْيَطْعِمْهُ ঃ যেন তাই খাওয়ায়। مِمَّا ঃ যা। يَأْكُلُ ঃ সে নিজে খায়। وَلْيُلْبِسْهُ ঃ এবং তাকে পরিধান করায়। يَلْبَسُ ঃ সে নিজে পরিধান করে। وَلاَيُكَلِّفُـهُ ঃ তার সাধ্যের বাইরে না চাপায়। مِنَ الْعَمَلِ ঃ

www.amarboi.org

কোন কাজ। مَا يَغْلِبُهُ ঃ যা তার সাধ্যের বাইরে। فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ঃ একান্ত যদি চাপানো হয় তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে শ্রমিকদের অধিকার ও শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং শ্রমজীবি মানুষটিকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে নিজের মতই খাওয়ার ও পরিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ দেয়া যাবে না। একান্ত যদি অতিরিক্ত কাজ দিতে হয়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ও জনবল দিয়ে সাহায্য করতে হবে। রাসূল (সা) অন্যত্র বলেছেন ঃ

حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمَنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

"দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার সৌভাগ্যের কাজ আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের কাজ।" (আবু দাউদ)

নিকৃষ্ট মালিক সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ اَلَّذِىْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ.

"ওহে! তোমাদেরকে কি আমি বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? যে একা খায়, যে নিজ দাস-দাসীকে মারে এবং যে নিজের সম্পদ হকদারকে দেয় না।" (মেশকাত)

অসদাচরণকারী মালিকের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

"দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" (তিরমিযী)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থ দু'টির পরিচয় ১নং দারসে দেয়া হয়েছে।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

www.amarboi.org

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ঃ ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে ঃ Industry is the key to success. 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।' যারা জগতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং উন্নতি ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করেছে তাদের মূলে ছিল বিরামহীন প্রচেষ্টা ও আমরণ শ্রম সাধনা। ইসলামে শ্রমের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঃ

১. পরিশ্রম ছাড়া সফলতা আসে না ঃ পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা পরিশ্রম ছাড়া এমনিতেই সমাধা হয়ে যায়। প্রত্যেক কাজেরই সফলতা পেতে হলে পরিশ্রম প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى.

"মানুষ শ্রম সাধনা ছাড়া কিছুই করতে পারে না।" (সূরা আন-নাজম ঃ ৪০)

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعٰى.

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার চেষ্টা-সাধনার প্রতিফল লাভ করবে।" (সূরা আত-ত্বাহা ঃ ১৫)

২. শ্রম ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার ঃ নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যেমনি পরিশ্রমের প্রয়োজন তেমনি জাতীয় উন্নতির একমাত্র মাধ্যম হল সম্মিলিত শ্রম প্রয়াস। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ.

"যে জাতি নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে না আল্লাহও তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দেন না।" (সূরা আর-রা'দ ঃ ১১)

৩. হালাল উপার্জন ফরয ঃ নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল জীবিকা উপার্জন করাকে ইসলামে ফরয করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

"অন্যান্য ফরযের মত হালাল উপার্জন করাও একটি ফরয।" (বায়হাকী)

৪. দিনের সৃষ্টি উপার্জনের জন্য ঃ দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টাকে আল্লাহ তা'আলা বিভক্ত করেছেন শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের স্বার্থে। আল্লাহর বাণী ঃ

www.amarboi.org

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.

"দিনকে বানিয়েছি জীবিকার্জনের জন্য।" (সূরা আন-নাবা ঃ ১১)

৫. পরিশ্রম করা আল্লাহর নির্দেশ ঃ ইসলামের বুনিয়াদি ইবাদত নামায সমাপ্ত হওয়ার পরই শ্রম বিনিয়োগ ও উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

"নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ কর।" (সূরা আল জুমু'আ ঃ ১০)

৬. অন্যের গলগ্রহ না হওয়া ঃ পরিশ্রম না করে অপরের গলগ্রহ হওয়ার জন্য ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। আজকের যুব সমাজ কাজ না করে পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর নির্ভরশীল ও গলগ্রহ হয়ে নিজেদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে এবং জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ "তোমরা মুসলিম সমাজের গলগ্রহ হয়ো না।" (আল-হাদীস)

৭. শ্রম পাপ মোচন করে ঃ শ্রম শ্রমিকের পাপ মোচনে সহায়তা করে। রাসূল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তার সব পাপ মাফ হয়ে যায়।" (মুসলিম)

৮. শ্রম উত্তম খাদ্য গ্রহণের পূর্বশর্ত ঃ উপার্জিত জীবিকা উত্তম হওয়ার শর্ত হচ্ছে পরিশ্রম। রাসূল (সা) বলেন ঃ "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন।" (বুখারী)

৯. শ্রম মান-হানিকর নয় ঃ কায়িক শ্রম মান-হানিকর নয়ই বরং তা মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের মহানবী (সা) একজন আদর্শ শ্রমজীবি মানুষ ছিলেন এবং অন্যকেও শ্রমের প্রতি উৎসাহিত করতেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।" (বুখারী)

www.amarboi.org

১০. শ্রম সকল উন্নতির চাবিকাঠি ঃ পরিশ্রম উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি। মহানবী (সা) ছোট বেলা থেকেই চাচা আবু তালেবের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।

শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা) ঃ মহানবী (সা) নিজে পরিশ্রম করে এবং অন্যকে পরিশ্রম করার উপদেশ দিয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। মদীনায় মসজিদ নির্মাণ ও খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সুঠামদেহী ব্যক্তি ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে নিজ হাতে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহের উপদেশ দেন। মহানবী (সা) নিজে শ্রম ব্যয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একবার তার ফোস্কা পড়া হাত দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ "এটি এমন একটি হাত যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) পছন্দ করেন।" তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, "নিজ শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত খাদ্য হতে উত্তম খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।" এসবই মহানবীর (সা) শ্রমের মর্যাদা দানের উজ্জ্বলতম আদর্শ। যা আজও বিশ্ববাসীর নিকট অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে।

ইসলামে শ্রমিকের অধিকারসমূহ ঃ ইসলাম শ্রমিকের যে অধিকার নিশ্চিত করেছে দুনিয়ার অন্য কোন মতবাদ তা করতে পারেনি। সংক্ষেপে শ্রমিকের অধিকারসমূহ নিম্নে আলোচনা করা গেল ঃ

১. শ্রমিকদের নিরাপত্তার অধিকার ঃ শ্রমিক তাদের জান-মালের নিরাপত্তা ও চাকুরীর নিরাপত্তা পাবে। এটা তার অধিকার। যে ব্যক্তি তাদের জান-মালের নিরাপত্তা ও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান করতে পারবে না তার কোন অধিকার নেই শ্রমিক নিয়োগ করার। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।" (সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ৩১৫)

www.amarboi.org

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ বাণী ছিল– (এক) নামায এবং (দুই) যারা তোমাদের অধীনস্থ তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

২. ন্যায্য বেতন-ভাতা পাওয়ার অধিকার ঃ শ্রমিক নিয়োগের পূর্বেই তার মজুরী নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

"প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের পুরো মাত্রায় প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। তাদের প্রতি কখনও যুলুম করা হবে না। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৯)

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) نَهٰى عَنْ اِسْتَجَارَةِ الْاَجِيْرِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ.

"রাসূল (সা) শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।" (বুখারী)

মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনরূপ যুলুম করা চলবে না। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কোন ভাল মানুষের কাজ নয়। আর ঈমানদারগণ এ কাজ কখনও করতে পারে না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ.

"রাসূল (সা) শ্রমিকদের মজুরী দানের ব্যাপারে কোনরূপ যুল্‌ম করতেন না এবং যুল্‌মের প্রশ্রয় দিতেন না।" (বুখারী)

রাসূল (সা) শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ করার তাকিদ করেছেন ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْــرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عِرْقُهُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ করে দাও।" (ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

৩. ছুটি লাভের অধিকার ঃ শ্রমিকদের কাজের ফাঁকে অবসর নেয়া এবং ছুটি লাভের অধিকার নিশ্চিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ওপর আরোপিত কাজকে সহজ ও হালকা দেখতে চান; কাঠিন্যতা পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা আরোপ করতে চান, কঠোরতা আরোপ করতে চান না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫)

مَا خَفَّفْتَ عَلٰى خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهٖ كَانَ لَكَ اَجْرًا فِىْ مَوَازِيْنِكَ.

"তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নিবে কিয়ামতের দিন তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে।" (তারগীব ও তারহীব)

"তোমাদের কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে। এটাই আল্লাহ্ ভালবাসেন।" (বায়হাকী)

৪. মুনাফায় শ্রমিকদের অধিকার ঃ মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ নির্ধারণ করলে শ্রমিকগণ নিজের লাভের আশায় ঐ কাজকে নিজের কাজ মনে করে করবে। কারণ বেশী লাভ হলে সেখানে তারও একটি অংশ থাকবে, ফলে সে বেশী পাবে।

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ.

"যেন তারা তার ফল খেতে পারে, যা তাদের হাত দ্বারা সম্পন্ন করেছে।" (সূরা ইয়াসিন ঃ ৩৫)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তার হাত ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসাও। সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দু'এক মুঠো খাদ্য অন্ততঃ তাকে অবশ্যই খেতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে।" (তিরমিযী)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "শ্রমিককে তার শ্রম উৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান করো। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না।"

www.amarboi.org

৫. শিশু শ্রম নিষিদ্ধ ঃ শিশুর দ্বারা শ্রমের কাজ করানো সম্পূর্ণ অন্যায়। কোমল শিশুদেরকে পরিশ্রমের কাজ থেকে বিরত রাখা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। আর শিশুদেরও অধিকার রয়েছে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠা। তাদেরকে শিশু বয়সে কাজের বোঝা দিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সামর্থ্যের বাইরে কোন বোঝা বহন পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا.

"আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দিবেন না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬)

আমাদের প্রিয় নবী (সা) শিশুদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا.

"যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ দেখায় না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)

اَلْاَطْفَالُ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ.

"শিশুগণ জান্নাতের প্রজাপতি।"

৬. ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অধিকার ঃ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে, তাতে উৎপাদন ব্যাহত হবে। ইসলামের নীতি হচ্ছে, সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শভিত্তিক কাজ করা। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"(হে নবী!) কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

তিনি আরও বলেন ঃ

www.amarboi.org

"তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৮)

আল্লাহ বহু বিষয় এমন রেখে দিয়েছেন, যেসব বিষয়ে সরাসরি কোন ওহী নাযিল হয়নি বরং সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-কে পরামর্শ করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করলে তিনি (আল্লাহ) খুশী হন। ইমাম জাস্‌সাস আহকামুল কুরআনে বলেন, এ আয়াতে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শ সাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার নিজস্ব মতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاؤُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَ اَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (ترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের নেতাগণ হবেন ভাল মানুষ, ধনী ব্যক্তিগণ হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে তোমাদের জন্য উত্তম। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। (তিরমিযী)

আলোচ্য হাদীসখানায় শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের উপাদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে তিনটি ইতিবাচক (সৎ) গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। যথা ঃ (১) খোদাভীরু নেতৃত্ব; (২) ধনীলোক হবে গরীবের বন্ধু; (৩) সামগ্রিক কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে হবে এবং তিনটি নেতিবাচক (অসৎ) গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ (১) অসৎ শাসক বা নেতা; (২) ধনী ব্যক্তির কৃপণ হওয়া; (৩) নারীদের নেতৃত্ব।

www.amarboi.org

হাদীসে বর্ণিত তিনটি ইতিবাচক (সৎ) গুণাবলী অর্জন করে সকল কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত করলে সমাজে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করবে। আসমান হতে কল্যাণ ও বরকত বর্ষিত হবে। যমীন তার সকল উর্বর শক্তি দিয়ে প্রচুর শস্য ও ফসল উৎপাদন করবে। মোটকথা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে পৃথিবী বেহেশ্‌তে পরিণত হবে।

পরামর্শের গুরুত্ব ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম সমাজের লোকদের জন্য নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পাদনে ও যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক পরামর্শ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। পরামর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ

لَا خِلَافَةَ اِلاَّ عَنْ مَشْوَرَةٍ.

"পরামর্শ করণ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না।" (কানযুল উম্মাল) আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ "তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়।" (তিরমিযী)

পরামর্শ করার গুরুত্বের কারণ

পরামর্শের গুরুত্বের কারণ প্রধানত তিনটি। যথা ঃ

ক. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে পরামর্শ ইনসাফের দাবী।

খ. নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য স্বেচ্ছাচারি মনোভাব, অপরের অধিকার হরণ অথবা যাতে তাদেরকে হেয় জ্ঞান করা না হয়, এজন্য পরামর্শ জরুরী।

গ. যে সকল বিষয়াদি অপরের স্বার্থের সাথে জড়িত তার ফয়সালা করা কঠিন কাজ এর জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণেই পরামর্শ করতে হবে।

৭. ওভার টাইম ও বোনাস পাওয়ার অধিকার ঃ শ্রমিকদেরকে যে সময়ের

www.amarboi.org

জন্য চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হবে সে সময়ের চেয়ে বেশী কাজ করালে তাকে ওভার টাইমের পারিশ্রমিক দিতে হবে। তাছাড়া দেশে প্রচলিত নিয়ম ও বিধি মোতাবেক উৎসব ভাতা প্রদান করতে হবে। এতে শ্রমিকদের মন-মানসিকতা ভাল থাকবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহের নীতিকে পছন্দ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

فَيُوَفِّيهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ.

"তাদেরকে ভাল কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৪)

لاَيُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَامَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

"শ্রমিকের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ যেন তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য।" (বুখারী)

হাদীসের এ অংশে যে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, আতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন-ভাতা দেয়া এবং জনবল দিয়ে তার কাজে সাহায্য করা অথবা নিজে কাজ করে তার কাজের বোঝা হালকা করে দেয়া।

৮. সংগঠন করার অধিকার ঃ ইসলাম সকলকে একত্রে থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিচ্ছিন্ন থাকা ইসলাম পছন্দ করে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًاوَّ لاَتَفَرَّقُوْا.

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একত্রিত হয়ে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ.

"যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে

www.amarboi.org

যেন ইসলামের রজ্জুকে তার গর্দান থেকে আলাদা করে নিল।" (আহমদ, আবু দাউদ)

শ্রমে নিয়োজিত লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি, স্বার্থরক্ষা, নিরাপত্তাদান ও যুল্‌ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠে তাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে।

ইসলামী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১. ইসলামী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা;

২. ন্যায়ের প্রতষ্ঠিা করা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা;

৩. ভাল কাজে সহযোগিতা করা অন্যায় কাজে সাহায্য না করা;

৪. সকলের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা;

৫. অন্যায় ও যুল্‌মের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা।

শিক্ষা

১. শ্রমিকদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

৩. নিজে যা খাবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে।

৩. নিজে যা পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করাবে।

৪. সাধ্যের বাইরে কোন কাজ চাপানো যাবে না।

৫. অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-১১

আল্লাহর শোকর আদায়

وَعَنْ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ. (مسلم)

অর্থ ঃ হযরত সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এটা শুধু মু'মিন ব্যক্তিরই বৈশিষ্ট্য। যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে সবর করে। আর এ সবর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর সে যদি সচ্ছলতা লাভ করে, তাহলে শোকর করে, আর এ শোকর তার জন্য অশেষ কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ وَعَنْ صُهَيْبٍ (رض) ঃ হযরত সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত। قَالَ তিনি বলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা) বলেছেন। لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ ঃ মু'মিন ব্যক্তির ব্যাপারটাই। عَجَبًا ঃ অদ্ভুত। اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ঃ তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। وَلَيْسَ ذَالِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ঃ এটা শুধু মু'মিন ব্যক্তিরই বৈশিষ্ট্য। اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ ঃ যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়। صَبَرَ ঃ তাহলে সবর করে। فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ঃ আর এ সবর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ ঃ আর সে যদি সচ্ছলতা লাভ করে। شَكَرَ ঃ তাহলে শোকর করে। فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ঃ আর এ শোকর তার জন্য অশেষ কল্যাণকর হয়।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে মু'মিন ব্যক্তির চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা

www.amarboi.org

যখন বিপদ-আপদে পতিত হয় তখন তারা ধৈর্য ধারণ করে । এটাও হয় তাদের জন্য কল্যাণকর। আর যখন তারা সচ্ছলতা লাভ করে তখন তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে। শোকর আদায় করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একটি উত্তম গুণ যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই প্রশংসনীয়। আল্লাহ তা'আলা যে সব নি'আমত দান করেছেন তা তাঁর মর্জি মোতাবেক ব্যবহার করলেই তাঁর শোকর আদায় করা হবে। নিম্নের হাদীস দ্বারা শোকর আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (সা) সাহাবীদের এক সমাবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে একত্র হয়ে কি করছ ? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, আমরা এখানে একত্র হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তার গুণকীর্তন করছি, এ কারণে যে, তিনি ইসলামরূপ নি'আমতের দিকে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলামরূপ নি'আমত দ্বারা আমাদের প্রতি করুণা করেছেন। (মুসলিম)

মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পার্থিব জীবনে তাদের জন্য দান করেছেন অফুরন্ত নি'আমত। প্রতিনিয়ত মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নি'আমতরাজী নানাভাবে ভোগ করে চলছে। গগণে ভূবনে ও সাগরে নগরে শুধুই তার অনুগ্রহ, অনুকম্পা। মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহর দেয়া বিশেষ নি'আমত। চোখ খুললে এ মহা বিশ্বে যা দেখতে পাওয়া যায় অথবা যা পরমাণুর মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেখতে পাওয়া যায় না, সকলই আল্লাহর সৃষ্টি এক অফুরন্ত দান। এ জন্যই আল্লাহ পাকের শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য কতর্ব্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত নি'আমতের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

"তোমরা যদি আল্লাহর নি'আমত গণনা করতে চাও তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না, মানুষ বড়ই অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৪)

www.amarboi.org

আমাদের সকলেরই আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنَ.

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর তোমরা শোকর করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫২)

তিনি আরো বলেন ঃ

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ.

"বরং কেবল আল্লাহরই ইবাদত করো এবং শোকরগুজারদের অন্তর্ভুক্ত থাকো।" (সূরা আল-জুমার ঃ ৬৬)

যারা বিকৃত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহর দীন কায়েম করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে শোকর আদায় করার সদগুণ থাকা একান্ত অত্যাবশ্যক। শোকরের মৌলিক গুণাগুণ এটাই যে, সে চিন্তা করে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কি নি'আমত দান করেছেন। এ দুনিয়ায় আসার পূর্বে মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে আল্লাহ তাকে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরপর এ দুনিয়ায় আগমনের পর তিনি তাঁর লালন পালনের সার্বিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেছেন। সে জন্মের পর সম্পূর্ণ অসহায় ছিল। মুখে না ছিল ভাষা না ছিল চলার শক্তি। আল্লাহই পর্যায়ক্রমে তার দেহে শক্তি, মুখে ভাষা ও মস্তিষ্কে চিন্তা-শক্তি দান করেছেন। তারপর খাদ্য ও বায়ুসহ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন মেটাবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রেখেছেন। মানুষ এসব বিষয় চিন্তা করলে একদিকে তার ওপর আল্লাহর অফুরন্ত করুণা ও রহমত দেখতে পাবে। আল্লাহর রহমতস্বরূপ যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন এ নি'আমতদানকারীর প্রতি তার মনে কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে উঠবে। দেহের সকল শক্তি স্বীয় মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য তৎপর হবে। এ অবস্থা ও আবেগ প্রকাশের নামই হচ্ছে শোকর। আর এটাই সকল কল্যাণের মূল উৎস।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ সহীহ মুসলিম।

(মেহেরবানী করে ১নং দারস দেখুন)

www.amarboi.org

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত সুহাইব (রা)।

নাম ঃ সুহাইব, পিতার নাম ঃ সিনান কুনিয়াত ঃ আবু ইয়াহ্ইয়া। তিনি বনু তামীম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'মুসেল' নামক উপত্যকায় তিনি বসবাস করতেন। তাঁর পিতা সিনান পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত 'ওবালা' নামক স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। একবার রোমান সৈন্যরা ঐ এলাকায় আক্রমণ করে বহু লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে সুহাইব (রা) একজন ছিলেন। জনৈক আরব ব্যবসায়ী তাঁকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং আবদুল্লাহ বিন জাদ'আনের নিকট বিক্রি করেন। পরে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ রাসূল (সা) নবুওয়ত প্রাপ্তির পর যখন দীনের প্রচার শুরু করেন তখন তিনি ও হযরত আম্মার (রা) একত্রে ইসলাম কবুল করেন। আর রাসূল (সা) যখন হযরত আম্মার (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ত্রিশের উর্ধ্বে।

নির্যাতন সহ্য ঃ হযরত সুহাইব (রা) দীনি আন্দোলনে শামিল হওয়ার অপরাধে তাঁকে মক্কার কুরাইশদের মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনের শিকার হতে হয়। হযরত বেলাল, আম্মার ও খাব্বাবের মত নির্যাতনের কারণে তিনিও মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন।

হিজরত ঃ কুরাইশদের নির্যাতনের সীমা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি মদীনায় হিজরত করতে মনস্থির করেন। কিন্তু কি করে তিনি হিজরত করবেন ? সেখানে ছিলো কাফিরদের বাধা। তারা প্রস্তাব দেয়, হিজরত করতে হলে তাঁর সকল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে যেতে হবে। কাফিরদের এ প্রস্তাবে তিনি রাজী হন এবং সানন্দে সকল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে রাসূলের খেদমতে হাজির হন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য

www.amarboi.org

নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আল্লাহ তাঁর এসব বান্দার প্রতি খুবই মেহেরবান। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৭)

রেওয়ায়াত ঃ তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকেও একদল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ তিনি ৮০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। (আসমাউর রিজাল)

শোকর অর্থ ঃ শোকর (الشُّكْرُ) আরবী শব্দ। এর অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শোকর অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নি'আমতরাজি ভোগ করে তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাকে "শাকের" বা কৃতজ্ঞ বলা হয়। "শাকের" বা শোকর আদায়কারী বলতে বুঝায় সে লোককে, যাকে তাকদীর অনেক উচ্চে উন্নীত করে দিলেও 'তাকে সে নিজের প্রতিভার জোর মনে করে না। মনে করে এটা আল্লাহরই পরম অনুগ্রহ। আর চরমভাবে অধঃপতনে পড়ে গেলেও সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করতে শুরু করবে না। তখন সেসব নি'আমতের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, যা চরম খারাপ অবস্থায়ও মানুষ পেতে থাকে। সচ্ছলতা ও খারাপ অবস্থা উভয় অবস্থাতেই তার মুখে ও দিলে আল্লাহর অশেষ শোকরই ধ্বনিত হতে থাকবে। (তাফহীমুল কুরআন)

আমাদের সৃষ্টি, জীবন, পানাহার, ঘুম-নিদ্রা, জাগ্রত থাকা, উন্নতি-প্রগতি ও রুজি-রোজগার, তথা সব কিছুই আল্লাহর মহিমা ও কৃপার দ্বারাই হচ্ছে, এরূপ মেহেরবান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করুন।

রাসূল (সা) হযরত মা'য়ায (রা)-কে বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে দোয়া কর যে, তিনি যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করেন।

রাসূল (সা) বলতেন, "যাকে শোকর আদায়কারী অন্তর দেয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শ্রেষ্ঠতম নি'আমত দান করা হয়েছে।"

www.amarboi.org

আল্লাহর নি'আমতসমূহ প্রকাশ করাও শোকর ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে নি'আমতসমূহ দান করেছেন মানুষের সামনে তা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

"আপনার পালনকর্তার নি'আমতের কথা প্রকাশ করুন।" (সূরা আদ-দুহা ঃ ১১)

যারা আল্লাহর দেয়া দানসমূহকে গোপন রাখে তারা তাদের পালনকর্তার শোকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ চান বান্দা তাঁর প্রদত্ত নি'আমতের শোকর আদায় করুক।

জনৈক সাহাবী (রা) অতি ময়লাযুক্ত ও সাধারণ পোশাকে রাসূল (সা)-এর দরবারে হাজির হলেন। রাসূল (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দরিদ্র ? জবাবে সাহাবী (রা) বললেন, না। সোনা-রূপা, বাগ-বাগিচা ও ফসলের ক্ষেত সব কিছুই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন, তাহলে আল্লাহর দানের বহিঃপ্রকাশ তোমার উপর কর্তব্য। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।" (মাযহারী)

শোকরের রোকনসমূহ ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র) শোকরের তিন রোকন নির্দেশ করেছেন। যথা ঃ

(১) ইল্‌ম-জ্ঞান;

(২) হাল-অবস্থা;

(৩) আমল-কর্ম।

নিম্নে শোকরের রোকনসমূহের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) ইল্‌ম বা জ্ঞান ঃ পৃথিবীতে আমরা যত নি'আমত উপভোগ করি এবং নি'আমত অর্জনের যত উপায়-উপকরণ দেখি এ সকল কিছুই আল্লাহর

www.amarboi.org

দান। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ কিছুই পেতে পারেনা। এ সত্যটি উপলব্ধি করে যে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছে তার নামই ইলম বা জ্ঞান।

(২) হাল বা অবস্থা ঃ এখানে শোকরগুজারকারীর মানসিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত নি'আমতরাজির শোকর আদায় কালে শোকরগুজারকারী ব্যক্তির আন্তরিক ও বিনম্র চিত্তে শোকর আদায় করার নামই হাল বা অবস্থা।

(৩) আমল বা কর্ম ঃ শোকর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং অন্তরের বিনম্রভাব সৃষ্টির পরই আমল বা কর্মের মাধ্যমেই একে বাস্তবে রূপায়ণ করতে হয়।

প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত শোকরিয়া এটাই যে, যে কাজের জন্য আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন সে কাজেই তাকে ব্যবহার করা। যেমন ঃ

(১) মুখের শোকর হলো এ থেকে এমন কোন কথা বের হবে না যা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী।

(২) পায়ের শোকর হলো এর দ্বারা আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে না চলা।

(৩) চোখের শোকর হলো এর দ্বারা নিষিদ্ধ দৃশ্য অবলোকন না করা।

(৪) মস্তিষ্কের শোকর হলো এর দ্বারা এমন চিন্তা-ভাবনা করা যার মধ্যে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হয়।

(৫) অন্তরের শোকর হলো এর মধ্যে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর মহব্বতকে স্থান দেয়া ও কুচিন্তা স্থান না দেয়া।

(৬) শক্তি সামর্থ্য ও ধন-সম্পদের শোকর হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করা।

শোকরের প্রকারভেদ ঃ অবস্থাভেদে শোকরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(১) সুখের শোকর;

(২) দুঃখের শোকর।

www.amarboi.org

সুখের অবস্থায় শোকর ঃ সুখ ও সমৃদ্ধির অবস্থায় আল্লাহর নি'আমত ভোগের ফলে মনে প্রশান্তি আসে। এ সময় শয়তানের ধোঁকায় আল্লাহকে ভুলে যেতে পারে। এ কারণে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দু'আ করবে এবং সুখের অবস্থা স্মরণ করে আল্লাহর নি'আমতের শোকর আদায় করবে। কোন অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

إِيَّاكَ وَالشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ الْهَنِيْئَةِ.

"তুমি অবশ্যই আল্লাহর শোকর আদায় করবে। কেননা, তোমাদের জীবন, ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন সবই আল্লাহর সুমধুর দান।"

দুঃখের অবস্থায় শোকর ঃ মানুষের জীবনের সাথে বালা-মুসিবত ও সুখ-দুঃখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুঃখের সময় বিরক্তিভাব পোষণ না করে ধৈর্যের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। দুঃখ চিরস্থায়ী কোন বিষয় নয় বরং দুঃখের পরে সুখ আসে একথা উপলব্ধি করে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনায় মনে ও মুখে পাঠ করা উচিত এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমরা আপনার জন্য এবং আপনার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৬)

ভবিষ্যতের সুখের প্রত্যাশায় দুঃখের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখার নামই দুঃখের সময়ে শোকর আদায়। আমাদের প্রিয় নবী এ প্রসঙ্গে (সা) বলেন ঃ

إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ.

"ঈমানদার ব্যক্তি যখন সুখে থাকে তখন সে শোকর আদায় করে। আর যখন সে বিপদে পড়ে তখন সে ধৈর্যধারণ করে।" (মুসলিম)

শোকরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঃ শোকর প্রকাশ মানব চরিত্রের এক অমূল্য সম্পদ। এটা যেমন আল্লাহর সন্তোষ ও অধিক নি'আমত লাভের জন্য অপরিহার্য তেমনি সামাজিক সাম্য-সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

www.amarboi.org

নিম্নে শোকরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো ঃ

১. পরকালে পুরস্কার লাভ ঃ যারা সুখে দুঃখে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে আল্লাহ পরকালে তাকে পুরস্কৃত করবেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

"অতি শীঘ্রই আল্লাহ শোকরগুজার বান্দাদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

২. সম্মান বৃদ্ধি ঃ শোকরগুজার ব্যক্তির মর্যাদা অপরিসীম। যে ব্যক্তি শোকরগুজার হয় আল্লাহ তার মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাতে বৃদ্ধি করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

"কৃতজ্ঞ আহারকারীর মর্যাদা ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান।" (বুখারী)

৩. সম্পদ বৃদ্ধি ঃ আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত নি'আমত লাভ করে যারা যথানিয়মে শোকর আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন যাতে তারা আরো অধিক পরিমাণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে (নি'আমত) বাড়িয়ে দেব এবং যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

৪. মজবুত ঈমানের লক্ষণ ঃ প্রাচুর্যে ও অভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করা মজবুত ঈমানের লক্ষণ। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ.

"সে যদি প্রাচুর্য লাভ করে তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যখন

www.amarboi.org

তার উপর দুঃখ নেমে আসে তখনও সে (ধৈর্যধারণ করে) আল্লাহর শোকর আদায় করে।" (মুসলিম)

৫. ইবাদতের পূর্ণতা বিধান ঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা ইবাদতের পূর্ণতা বিধান হয়। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তেমনিভাবে আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতের শোকর আদায় করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

"এবং তোমরা আল্লাহর নি'আমতরাজির শোকরিয়া আদায় কর; যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর, ।" (সূরা আন-নাহল ঃ ১১৪)

৬. সমাজে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তারা একত্রিত হয়ে বসবাস করে। একে অপরের সুখে-দুঃখে সাহায্য করে। সাহায্যকারী ব্যক্তি যাকে সাহায্য করেন তার থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করেন এটা হলো মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। যখনই সমাজে একে অপরের কাজে সহায়তা করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর নিকটও কৃতজ্ঞ নয়।"

৭. সহজে মর্যাদা লাভ ঃ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজে সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। মৌখিকভাবে সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমেই অপরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। যাতে মানুষের কোন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সমাজের সকলেই সাহায্য ও শ্রদ্ধা করেন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের আপনজনরাও পছন্দ করেনা। সুতরাং শুধু ধর্মীয় জীবনে নয় বরং পার্থিব, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও কৃতজ্ঞতাবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ। এ কারণেই অতি সহজে ও বিনা ব্যয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মানবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে শোকরের গুরুত্ব অপরিসীম। পরকালে জান্নাতের নি'আমত লাভ করেও জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে। সুতরাং

www.amarboi.org

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের ক্ষেত্রে শোকর সমান গুরুত্ব বহন করে। এ কারণেই কুরআনে শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে ঃ

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ.

"তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া রিয্ক উপভোগ কর এবং তাঁর শোকর আদায় কর।"

মানুষ কিভাবে না-শোকরী করে ঃ মানুষ তার কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই আল্লাহ্‌র না-শোকরী করে থাকে। যেমন ঃ

১. আল্লাহ্‌র নি'আমত ভোগ করে আল্লাহ্‌রই ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটা না-শোকরী।

২. আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরক করা না-শোকরী করার নামান্তর।

৩. কুফরী করাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার না-শোকরী করা।

৪. আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি সামর্থ্যকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা না-শোকরী করা।

৫. আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান গ্রহণ না করা এবং নিজেই নিজের আইন প্রণেতা সাজা মানে আল্লাহ্‌র না-শোকরী করা।

শোকর আদায়ের পদ্ধতি ঃ কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করে থাকে। মানুষ যখন যে কাজ করবে সে কাজে রাসূল (সা)-এর শেখানো দু'আ পাঠ করবে। যেমন ঃ খাওয়ার পূর্বে ও পরে খাওয়ার দু'আ পাঠ করা, ঘুমের সময় ঘুমের দু'আ পাঠ করা, যানবাহনে চলার সময় যানবাহনের দু'আ পাঠ করা ইত্যাদি মাসনুন দু'আ পাঠের মাধ্যমে শোকর আদায় হয়ে যায়।

১. আল্লাহ্‌র নি'আমতের সঠিক শোকর আদায় হচ্ছে তাঁর দাসত্ব করা।

২. আল্লাহ্‌র নি'আমতের সঠিক শোকর আদায় হচ্ছে তাঁর আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৩. আল্লাহ্‌র নি'আমতের সঠিক শোকর আদায় হচ্ছে আল্লাহ্ যা কিছু দান করেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

www.amarboi.org

৪. আল্লাহর নি'আমতের সঠিক শোকর আদায় হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৫. আল্লাহর নি'আমতের সঠিক শোকর আদায় হচ্ছে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

শোকর আদায়ের নীতি ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا.

"তবে তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাওবা করবে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেবে, তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে। আর শীঘ্রই আল্লাহ মু'মিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। আল্লাহর কি প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো? আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৬ ও ১৪৭)

মূল আয়াতে 'শোকর' ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে নি'আমতের স্বীকৃতি দেয়া, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তাঁর সাথে নিমকহারামী না কর বরং যথার্থই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত থাক, তাহলে আল্লাহ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না। একজন অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি ? হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এই অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। এ তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে শোকর। এই শোকরের দাবী হচ্ছে,

www.amarboi.org

প্রথমতঃ অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করতে হবে। অনুগ্রহের শোকরগুজারী করার এবং নেয়ামতের স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি প্রেম-প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরপুর থাকবে এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকবে না।

তৃতীয়তঃ কার্যত অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং তিনি যে নি'আমতগুলো দান করেছেনে সেগুলো তার মর্জির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। (সূরা আন-নিসা, টীকা ঃ ১৭৫)

শিক্ষা

১. মু'মিন ব্যক্তির ব্যাপারটাই অদ্ভুত।

২. মু'মিন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলে সবর করে।

৩. আর সচ্ছলতা লাভ করলে শোকর আদায় করে।

৪. এ জন্য মু'মিনদের সুখ-দুঃখ সবটাই কল্যাণকর।

৫. আমাদেরকে সর্বাবস্থায় শোকর আদায় করা উচিত।

www.amarboi.org

দারস-১২

আখিরাতের প্রস্তুতি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَجُـلٌ يَّانَبِـيَّ اللّـٰهِ مَـنْ اَكْيَـسُ النَّـاسِ وَاَحْـزَمُ النَّـاسِ قَـالَ اَكْـثَرُهُمْ ذِكْـرًا لِّلْمَـوْتِ وَاَكْـثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِـرَةِ.

(طبرانی، معجم الصغير)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন ঃ লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয় লাভ করতে পারবে। (তাবারানী, মু'জামুস সগীর)

শব্দার্থ ঃ اَكْيَسُ ঃ অধিক বুদ্ধিমান? اَحْزَمُ ঃ অধিক সতর্ক। ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ ঃ মৃত্যুকে স্মরণ করে। اِسْتِعْدَادُ ঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। بِشَرْفِ ঃ মর্যাদা। كَرَامَةِ ঃ সম্মান।

ব্যাখ্যা ঃ যারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত আর পরকাল সম্পর্কে একেবারেই গাফিল, তারা কখনোই স্থায়ী সুখ জান্নাতের অধিকারী হতে পারে না। কাজেই যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) : اَلْكَيِّسُ مَـنْ

www.amarboi.org

دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَـوَاهُ وَتَمَنّٰـى عَلَى اللّٰهِ. (ترمذی)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নাফস্‌কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা করে, সেই (নির্বোধ) অক্ষম। (তিরমিযী)

ইহকালই মানব জীবনের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পরই জান্নাত বা জাহান্নাম রূপে তার যথাযথ ফল ভোগ করতে হবে। এটাই হল আখিরাত। তাই জাহান্নামের আযাব থেকে জান্নাতের চিরসুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"নিশ্চয়ই পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!" (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً.

"নিশ্চয়ই পরকালই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-ইসরা ঃ ২১)

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ.

"আখিরাতের আবাসই উত্তম এবং তা খোদাভীরুদের জন্য কতই না সুন্দর আবাস!" (সূরা আন-নাহল ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা

www.amarboi.org

করার উদ্দেশ্যে। এ পৃথিবীকে তিনি নানাবিধ লোভ, লালসা, আকর্ষণ ও চাকচিক্যময় করে সাজিয়েছেন। যাতে মু'মিন বান্দাগণ দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবনে বন্ধুর পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে আখিরাতের অফুরন্ত নি'আমত ও অনাবিল শান্তিময় জগতে পৌছতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.

"হে আমার সম্প্রদায়! দুনিয়ার জীবন হচ্ছে সামান্য। আর আখিরাত হল চিরস্থায়ী চিরন্তন আবাস।" (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৩৯)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

"আর আখিরাত হল উত্তম ও চিরস্থায়ী শ্বাশত।" (সূরা আল-আ'লা ঃ ১৭)

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى.

"আর আখিরাত হবে তোমার জন্য দুনিয়া থেকে উত্তম।" (সূরা আদ-দুহা ঃ ৪)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ তাবারানী।

ইমাম তাবারানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তাবারানী। তিনি তিন ভাগে 'আল-মু'জাম' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রতি ভাগের নাম যথাক্রমে ঃ

(١) المعجم الكبير: (٢) المعجم الصغير: (٣) المعجم الاوسط :

'আল-মু'জাম' যেসব হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন হাদীসের উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীস পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় তাকে 'আল-মু'জাম' বলা হয়।

প্রথম ভাগে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) ব্যতীত অপরাপর সাহাবীদের সনদ সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রার (রা) মুসনাদসমূহ তিনি স্বতন্ত্র এক খণ্ডে একত্রিত করেন। মু'জাম এর এই খণ্ডে তিনি প্রায় বিশ হাজার পাঁচশত হাদীস (মুসনাদ) একত্রিত করেছেন।

www.amarboi.org

এতে তিনি সাহাবীদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতা অবলম্বন করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থখানি এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এতে এক হাজার উস্তাদের নিকট হতে গৃহীত প্রায় পনের শত হাদীস একত্রিত করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগের গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রায় দুই হাজার উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ প্রত্যেক উস্তাদের নামের সনদে একত্রিত করেছেন। বলা হয় যে, এতে প্রায় ত্রিশ হাজার সনদে বর্ণিত হাদীস রয়েছে এবং তা ছয়টি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস)

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারের পরিচিতির জন্য ২নং দারস দেখুন।

আখিরাতের চিন্তা ঃ কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের সামনে তিনটি কঠিন মুহূর্ত উপস্থিত হবে। যথা ঃ (১) মিযানে যেখানে আমলনামা ওজন করা হবে। (২) আর যখন আমল হাতে দেয়া হবে এবং পড়তে বলা হবে। (৩) যখন জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হতে হবে। তখন মানুষ যার যার চিন্তায় আপন জনকেও ভুলে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَا يَبْكِيْنَ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَمَّا فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنِ فَلاَ يَذْكُرُ اَحْدٌ اَحَدًا، عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِيْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِيْ شِمَالِهٖ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ. (ابو داود)

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন আয়েশা কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে, তাই আমি কাঁদছি। কিয়ামতের দিন কি আপনি স্ত্রীদের কথা স্মরণ

www.amarboi.org

করবেন? তিনি বললেন ঃ (অবশ্যই স্মরণ করব) তবে তিনটি জায়গায় কেউ কাকেও স্মরণ করতে পারবে না। সে তিনটি জায়গা হলো ঃ

১. **মীযানে ঃ** যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকেই তার নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, তার (নেকের) পাল্লা ভারী হবে কি হালকা হবে।

২. **আমলনামা দেয়ার সময় ঃ** যখন আমলনামা হাতে দেয়া হবে এবং বলবে, তোমার রেকর্ড পড়। তখন সকলেই এ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, নাকি পিছনের দিক দিয়ে বাম হাতে দেয়া হবে এবং

৩. **পুলসিরাতে ঃ** যখন জাহান্নামের উপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)

পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের গুরুত্ব ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু আসার আগে জীবনের গুরুত্ব প্রদান করতে বলা হয়েছে। মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান সময়। এসময়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যথাসময় সকল কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতের আশায় কোন কাজ ফেলে রাখা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। মানুষ মরণশীল। যে কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু এসে যেতে পারে। তাহলে চিরজীবনের জন্য সে কাজ আর করা সম্ভব হবে না।

عَنْ عَمْرِو بْـنِ مَيْمُـوْنِ الْاَوْدِىِّ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ (صلعـم) لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْـلَ فَقْـرِكَ وَفَرَاغَـكَ قَبْـلَ شُـغْلِكَ وَحَيٰوتَـكَ قَبْـلَ مَوْتِكَ. (ترمذى)

হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি (সময় থাকতেই) গুরুত্ব প্রদান কর। যথা ঃ

১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের;

২. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের;

৩. দারিদ্র্য আসার আগে সচ্ছলতার;

www.amarboi.org

৪. ব্যস্ত হওয়ার আগে অবসর সময়ের;

৫. মৃত্যু আসার আগে জীবনের। (তিরমিযী)

দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা ঃ দুনিয়াটা পরকালের তুলনায় এতই সামান্য যে, অনামিকা অঙ্গুলি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে বের করে আনলে যে পরিমাণ পানি নিয়ে ফিরে আসে তার তুলনায়ও কম।

عَنْ مُسْتَوْرَدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِـرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهٖ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَـمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ. (مسلم)

হযরত মুস্তাওরাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেউ যদি তার এ অঙ্গুলি (রাবী উহার অর্থ বুঝাতে গিয়ে অনামিকা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করে বলেন, কেউ যদি তার অনামিকা অঙ্গুলি) সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখতে পাবে যে, সেই অঙ্গুলি কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। (মুসলিম)

দুনিয়ায় মু'মিনদের অবস্থান ঃ দুনিয়াকে সুশোভিত করে সাজানো হয়েছে, তাই কাফিরেরা দুনিয়ার পেছনে ছুটে এর থেকে জান্নাতের স্বাদ গ্রহণ করে; আর মু'মিন ব্যক্তিরা পরকালের চিন্তায় মশগুল থাকে। মানুষ যেমন জেলখানা থেকে মুক্ত হলে আনন্দ উপভোগ করে; তেমনিভাবে মু'মিনগণ দুনিয়ার জীবন পরিসমাপ্তি করে পরকালের আসল নিবাসে চলে গেলেই আনন্দ অনুভব করে। তাই তারা দুনিয়াকে জেলখানা মনে করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰـهِ (صلعـم) اَلدُّنْيَـا سِـجْنُ لِّلْمُؤْمِـنِ وَجَنَّةُ لِّلْكَافِرِ. (مسلم)

আবূ হুরায়রা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া মু'মিন লোকদের জন্য জেলখানা, আর কাফিরদের জন্য বেহেশ্ত। (মুসলিম)

www.amarboi.org

মু'মিন ব্যক্তিদের শরীয়তের 'হুদুদ' তথা আল্লাহর হুকুমের সীমারেখার ভেতরে চলতে হয়। শরীয়তের রজ্জু তার গলায় লটকানো থাকে বলে সে দুনিয়াকে জেলখানা মনে করে। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তি শরীয়তের যাবতীয় বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত মনে করে বলে ইচ্ছামত চলে। তাই দুনিয়াটা তারা বেহেশ্ত বলে মনে করে।

মু'মিন আখিরাতকে প্রাধান্য দেবে ঃ যারা দুনিয়াকে নিজের প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারা আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। পরকাল স্থায়ী। অতএব দুনিয়ার ভালবাসার তুলনায় পরকালকে প্রধান্য দেয়াই প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَـنْ اَحَـبَّ دُنْيَـاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَـاهُ فَـاٰثِرُوْا مَـايَبْقٰى عَلٰـى مَـا يَفْنٰى. (مسند احمد، بيهقى)

আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তার আখিরাতের ক্ষতি সাধন করবে। আর যে পরকালকে অধিক ভালবাসবে, সে অবশ্যই দুনিয়ার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব নশ্বর জগতের মুকাবিলায় স্থায়ী ও অক্ষয় পরকালকে গ্রহণ কর। (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

মু'মিনের জীবন ধারা ঃ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে পরকালের জন্য কাজ করে যাওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানিয়ে দুনিয়ার প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর কাছে নাজাতের প্রত্যাশা করা কাপুরুষের পরিচয়।

পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করা ঃ মানুষের দুনিয়ায় জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত তা বলে দেয়া হয়েছে। একজন মু'মিন দুনিয়ার জীবনকে সফরের যাত্রীর মত অতিবাহিত করবে এটাই স্বাভাবিক। পথিকের দৃষ্টি-ভঙ্গি আর স্থায়ী বসবাসকারীর দৃষ্টিভঙ্গি আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। স্থায়ী বসবাসকারী তার সকল কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করে যেন অবিনশ্বর

www.amarboi.org

হয়ে থাকবে। আর পথিক তার কাজ স্বাভাবিকভাবে করে যে, সে এখানে সাময়িকভাবে আছে। প্রয়োজন শেষে তার গন্তব্যস্থানে চলে যাবে। তাই মু'মিনদের জীবন-যাপন এমন হবে যে, পরকালের পাথেয় সংগ্রহের পরে সে তার আসল গন্তব্যস্থান পরকালে চলে যাবে। এজন্য কোন কাজ ফেলে রাখা উচিত নয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) بِمَنْكَبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাঁধ ধরলেন এবং বললেন ঃ তুমি দুনিয়ায় একজন প্রবাসী পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। (বর্ণনাকারী বলেন) হযরত উমার (রা) প্রায়শঃই বলতেন ঃ যখন সন্ধ্যা হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করবে না আর যখন সকাল হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। সুস্থ থাকা অবস্থায় রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য এবং জীবন থাকা অবস্থায় মৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। (বুখারী)

আখিরাতে বিচারের বিষয়বস্তু ঃ ইহজগৎ মানুষের কর্মক্ষেত্র । এখানে মানুষ যে আমল করবে পরজগতে তার ফল ভোগ করবে। দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব আখিরাতে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দিতে হবে। হিসাব দিতে হবে জীবন, যৌবন, আয়-ব্যয়, জ্ঞানার্জন ও আমলের। মোটকথা পার্থিব জগতের ভাল-মন্দ সকল কাজের হিসাবই দিতে হবে। বিশেষ করে নিম্নের হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তানের পা সামনে এক কদমও অগ্রসর করতে পারবে না। কাজেই আমাদের সকলকে পরকালে জবাবদিহী করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। পরকালের জবাবদিহিতা ও আখিরাতে বিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ لاَتَزُوْلُ قَدَمَ ابْنِ اٰدَمَ

www.amarboi.org

حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ. (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) আদম সন্তানের পা (স্বস্থান থেকে) একটুও নড়াতে পারবেনা যতক্ষণ না পাঁচটি ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১. তার জীবন কালটা কি কাজে শেষ করেছে;

২. তার যৌবনকাল কি কাজে নিয়োজিত রেখেছে;

৩. তার ধন-সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে;

৪. কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং

৫. সে অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী কতটা আমল করেছে। (তিরমিযী)

আখিরাতের ভয়াবহতা ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন। সে দিন মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ও কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে কেউ কারোর প্রতি তাকাবার কোন কল্পনা করবে না।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ. (متفق عليه)

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়ে উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, হে আয়েশা (রা)! সেদিনের

www.amarboi.org

অবস্থা এমন ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবার কোন কল্পনা করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের পাথেয় ঃ দুনিয়াতে যে যাকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন সে তার সঙ্গী হবে। তাই রাসূল (সা)-কে অধিক ভালবাসতে হবে, তাহলেই কেবল মাত্র তাঁর সঙ্গী হওয়া সম্ভব হবে।

عَنْ اَنَس (رض) اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) مَتَـى السَّـاعَةُ ؟ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْـدَدْتُ لَـهَا اِلاَّ اَنِّـىْ اُحِـبُّ اللّٰـهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعُ مَـنْ اَحْبَبْـتَ قَـالَ اَنَـسٌ فَمَـا رَاَيْـتُ الْمُسْـلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَرْحَهُمْ بِهَا. (بحارى، مسلم)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! কিয়ামতের জন্য তুমি কি পাথেয় যোগাড় করেছ? সে ব্যক্তি বলল, আমি উহার জন্য কিছুই যোগাড় করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসি। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতের দিন তুমি তারই সাথে থাকবে। হযরত আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ একথায় যত খুশি হয়েছে, তত আর কিছুতে খুশি হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষা

১. প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উচিত মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করা।

২. এবং উহার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৩. তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি যারা মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে।

৪. তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয় লাভ করতে পারবে।

৫. মৃত্যুর চেতনা ও পরকালের জবাবদিহীর অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-১৩

জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (بخارى)

অর্থ ঃ আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আমার নেক (সালেহ) বান্দাদের জন্য এমনসব নি'আমত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি। (রাবী বলেন, হাদীসটির সত্যতা প্রমাণের জন্যে) ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াতটি তোমরা পড়ে দেখতে পারো, "কোন মানুষই জানেনা আমি তাদের জন্য কি সব চক্ষু শীতলকারী পরম নি'আমত গুপ্ত রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো।" (বুখারী)

শব্দার্থ ঃ اَعْدَدْتُ ঃ আমি তৈরি করে রেখেছি। لِعِبَادِىْ ঃ আমার বান্দার জন্য। اَلصَّالِحِيْنَ ঃ নেক বান্দাহগণ। مَا لاَعَيْنٌ رَاَتْ ঃ কোন চোখ যা দেখেনি। لاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ ঃ কোন কান যা শুনেনি। لاَ خَطَرَ ঃ সে কল্পনা করেনি। عَلٰى ঃ উপর। قَلْبِ بَشَرٍ ঃ মানুষের অন্তর। اِقْرَؤُا ঃ তোমরা পড়। اِنْ شِئْتُمْ ঃ যদি তোমরা চাও। مَا اُخْفِىَ ঃ কি গোপন রাখা হয়েছে। قُرَّةُ اَعْيُنٍ ঃ চক্ষু শীতলকারী। جَزَاءَ ঃ প্রতিদান। يَعْمَلُوْنَ ঃ তারা আমল করে।

www.amarboi.org

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের জন্য জান্নাতে যে নি'আমত তৈরি করে রেখেছেন তা কেউ কল্পনা করতে পারেনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য জান্নাতে অফুরন্ত ও অতুলনীয় নি'আমতরাজির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ কল্পনাতীত। আর এর নামই হচ্ছে জান্নাত। সেখানে সুশীতল পানির নহরসমূহ প্রবাহিত। সুমিষ্ট ফল ও সুগন্ধি ফুলের বাগানে পরিপূর্ণ এবং সেখানে নানারূপ সুখাদ্য ও সুপানীয়ের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এতে দুগ্ধ, মধু, পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহমান। প্রাসাদসমূহ মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈরী। শয্যা ও আসনসমূহ মণি-মুক্তা খচিত। নর-নারী চির যৌবনা হবে। কখনো বৃদ্ধ হবে না। সেখানে কোন কিছুরই অভাব নেই, চাওয়া মাত্র সব পাওয়া যাবে। ব্যথা-বেদনা কোন কিছুই সেখানে কাউকে স্পর্শ করবে না। সেখানে চিরসুখ ও চিরশান্তি বিরাজিত। মানুষের এ পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে যদি সে আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলে, সৎকাজ সম্পন্ন করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রতিশ্রুত জান্নাত দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِدِيْنَ فِيْهَا.

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (সূরা আল-কাহাফ ঃ ১০৭-১০৮) তিনি আরো বলেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাতই তার আশ্রয়স্থল।"

www.amarboi.org

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ

সহীহ আল-বুখারী হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ

নাম ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

জান্নাত অর্থ ঃ জান্নাত (جَنَّةٌ) আরবী শব্দ একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে (جَنَّاتٌ) বা (جِنَانٌ)। উর্দূ ও ফারসিতে একে বেহেশ্‌ত বলা হয়। বাংলা ভাষায় একে স্বর্গ বলা হলেও এ শব্দের বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে।

১। বৃক্ষপূর্ণ বাগান;

২। পার্থিব মনোরম বাগিচা;

৩। আসমানী অনুপম সৌন্দর্যময় বাগান;

৪। চিরন্তন অমৃতময় শান্তিপূর্ণ অতুলনীয় আবাসস্থল;

৫। এমন শান্তিময় চিরস্থায়ী ঠিকানা যেখানে মৃত্যু নেই, রোগ-শোক নেই, দুঃখ-কষ্ট নেই, অভাব-অনটন নেই ও হিংসা-বিদ্বেষ নেই। আছে শান্তি আর শান্তি।

এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষ হবার পর, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নেক বান্দাদের জন্য যে অনন্ত, সুখময় ও চিরস্থায়ী সুসজ্জিত আবাস তৈরী করে রেখেছেন তাকে জান্নাত বা বেহেশ্‌ত বলে।

বেহেশ্‌তের নি'আমতসমূহ ঃ

১. বেহেশ্‌তের নি'আমত চিরস্থায়ী ঃ বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তি ও আনন্দ অফুরন্ত। পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ, রূপ-যৌবন, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি যা কিছু আছে এক দিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ মানুষকে যে নি'আমতরাজী দান করবেন তা সবই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত; তা কখনো শেষ হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

www.amarboi.org

"যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত ও অসীম পুরস্কার।" (সূরা আত-ত্বীন ঃ ৬)

জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের জন্য যে খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করে রেখেছেন তা চিরস্থায়ী। কোন মৌসুম সেখানে প্রভাব ফেলবে না।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ.

"মুত্তাকীদের পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, তার উপমা সেই উদ্যানের মত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং যার ফল-ফলাদি চিরস্থায়ী ও অনন্ত।"

২. **সুন্দর অবয়ব** ঃ মহান আল্লাহ জান্নাতিদের এমন শারীরিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দান করবেন যা কল্পনাতীত। পৃথিবীতে যার কোন তুলনা নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"প্রিয়তম ভক্ত বান্দাগণের মুখমণ্ডল আমার দর্শন ও তাজাল্লির জন্য নিতান্ত লাবণ্যময়, তরতাজা সদা হাসি ভরা থাকবে।" (সূরা আল-ক্বিয়ামা ঃ ২২, ২৩)

হাদীসে এসেছে ঃ জান্নাতের দরজায় একটি নদী আছে সে নদীর পানি পান করে বেহেশ্তবাসীদের অন্তরের কলুষতা ও মলিনতা দূর হবে এবং গোসল করে তাদের চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে।

৩. **সুস্বাদু পানীয়** ঃ মহান আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের জন্য বেহেশ্তের সুস্বাদু পানীয় ও নয়নাভিরাম ঝর্ণাধারার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যার পানীয় হবে দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি। যার রং কখনো পরিবর্তিত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

فِيْهَآ اَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ.

"তাতে রয়েছে চির নির্মল পানীয় স্রোতধারা, চির সুস্বাদু দুধের প্রবাহ যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হবে না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

৪. **পোশাক-পরিচ্ছদ** ঃ বেহেশ্তের মান উপযোগী এমন চাকচিক্যময়

www.amarboi.org

নয়নাভিরাম রেশমি পোশাক সরবরাহ করা হবে বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য। যার কল্পনাও দুনিয়াবাসী করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

"তারা বেহেশ্‌তে স্বর্ণের কাকন ও মোতির অলংকার পরিধান করবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৩)

৫. হুর হবে সঙ্গিনী ঃ বেহেশ্‌তের আয়তোলোচনা হুর হবে তাদের স্ত্রী। যারা হবেন সুশীলা, সুন্দরী ও সুরক্ষিতা। যাদের কখনো কোন মানুষ, কোন জ্বীন স্পর্শ করেনি। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই ধরনের এবং তারা হবে সমবয়সী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَحُوْرٌ عِيْنٌ. كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ.

"আর তাদের জন্য থাকবে এমন আয়তোলোচনা হুর যাঁরা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।" (সূরা ওয়াক্বিয়া ঃ ২২-২৩) তিনি আরো বলেন ঃ

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً. فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا. عُرُبًا اَتْرَابًا.

"আর হুরগণকে আমরা বিশেষ অবয়বে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী, স্বামী-সোহাগিনী ও সমবয়স্কা করে।" (সূরা ওয়াক্বিয়া ঃ৩৫,৩৬, ৩৭)

৬. বিলাস-বহুল আসবাবপত্র ঃ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ ও সুখ সম্ভোগের জন্য জান্নাতে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এমন বিলাসী অতি দামী আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করে রাখবেন, যার কল্পনা কোন কালেই কোন মানব হৃদয়ে রেখাপাত করেনি। জান্নাতীদের বিলাস সামগ্রী ও আসবাব পত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

"সেখানে উহারা হেলান দিয়ে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে বসবে। দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী।" (সূরা আর-রহমান ঃ ৫৪) তিনি আরো বলেন ঃ

www.amarboi.org

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.

"তারা হেলান দিয়ে এলিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার ওপর।" (সূরা আর-রহমান ঃ ৭৬)

৭. সুর সংগীতের মূর্ছনা ঃ শারীরিক চাহিদা যোগানের পাশাপাশি অন্তরের প্রফুল্লতা পবিত্র ও কোমলতা বৃদ্ধির জন্য বেহেশ্‌তে থাকবে সুর সংগীত, মূর্ছনা লহরীর ব্যবস্থা। জান্নাতীদের চিত্তাকর্ষণে সেখানে তিন ধরনের রাগ বা সংগীতের ব্যবস্থা করা থাকবে।

ক. তুবা নামক বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা হতে বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে সুমধুর সুর শ্রুত হবে। প্রত্যেক ঘরে একটি করে তুবা বৃক্ষ থাকবে।

খ. হুরগণ নিজেদের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিকে সুমিষ্ট সুরে গান করে আনন্দ দিবে।

গ. আল্লাহর দিদারের শুভক্ষণে হযরত ইসরাফিল (আ) ও দাউদ (আ) সমস্বরে সংগীতের সুরে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করবেন। যা শ্রোতাদের মুগ্ধ ও বিহ্বল করে তুলবে।

৮. আল্লাহর দিদার ঃ বেহেশ্‌তের সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত হলো আল্লাহর দিদার। আপন সৃষ্টির সামনে স্রষ্টা দর্শন দিবেন এ এক অপূর্ব শিহরণ, অপূর্ব দৃশ্য এবং অপূর্ব অনুভূতি। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহর নূরের তাজাল্লির সাথে সাথে বেহেশতবাসীরা অপলক নয়নে হাজার হাজার বছর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমোহিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকবে।"

জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে এবং এ স্তর অনুযায়ী আটটি নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

১. জান্নাতুল ফিরদাউস;

২. জান্নাতুল খুল্‌দ;

৩. জান্নাতুল আদন;

৪. জান্নাতুল মাওয়া;

www.amarboi.org

৫. জান্নাতুন নায়ীম

৬. দারুস সালাম;

৭. দারুল কারার;

৮. দারুল মাকাম।

জান্নাতের প্রথম দল ঃ জান্নাতের প্রথম দলে যারা শামিল হবেন তাদের অবস্থা কেমন হবে, সে সম্পর্কে নিম্নের হাদীসে অলোচনা করা হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُـوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِـى السَّـمَآءِ اِضَـاءَةً لاَيَبُوْلُـوْنَ وَلاَيَتَغَوَّطُـوْنَ وَلاَيَتْفُلُـوْنَ، وَلاَيَمْتَخِطُوْنَ، اَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَرَشْـحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَـامِرُهُمُ الْاَلُـوَّةُ عُوْدُ الطِّيْبِ اَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعَيْنُ عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُـوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَآءِ. (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা ঝিকমিক করা আলোকিত হবে। তাদেরকে পেশাব, পায়খানা করতে হবে না। তাদের মুখে থুথু আসবে না এবং নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিশকের মত সুঘ্রাণ। তাদের ধুপদানীর জ্বালানি হবে সুগন্ধি কাঠের। আয়তোলোচনা হুর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের স্বভাব হবে একই রকম। তাদের দৈহিক গঠন হবে উচ্চতায় তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর মত ষাট হাত লম্বা। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতের প্রশস্ততা ঃ জান্নাতের প্রশস্ততা ও পরিধি সম্পর্কে ধারণা করাতো বহু দূরের কথা, কল্পনা করাও অসাধ্য। জান্নাতের সব চেয়ে কম মর্যাদার লোকটিকেও এ পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ জায়গা দেয়া হবে।

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

"হে মু'মিনগণ তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও– যার প্রশস্ততা সমুদয় আকাশ ও জমিনের সমান, যা খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضَمَّرُ السَّرِيْعُ مِائَةَ سَنَةٍ مَايَقْطَعُهَا

(بخارى، مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে একাধারে একশত বছর চলতে থাকে, তবুও তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতের পরিবেশ ঃ বেহেশত চিরশান্তিময় স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জ্বরা-মৃত্যু ও বার্ধক্য থাকবে না। বেহেশতের ভিত্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। এর ভূমি মিশকের ন্যায়, বালি কর্পুরের ন্যায় এবং তরুলতা জাফরানের ন্যায় সুগন্ধি পূর্ণ সুশোভিত, সুমোহিত, সুসজ্জিত এবং ঝর্ণাধারাগুলো সুগন্ধে পরিপূর্ণ। এতে দুগ্ধ, মধু ও পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহমান। এতে নানা রকমের সুস্বাদু ফলের বাগান রয়েছে। বেহেশতের প্রাসাদসমূহ মণি-মুক্তা ইয়াকুত ও জমরুত পাথরের তৈরী। তার সজ্জা ও আসনসমূহ মণি-মুক্তা খচিত। তথায় শীতও নেই গরমও নেই বরং সদা বসন্ত বিরাজমান। সেখানে নর-নারী প্রত্যেকেই চির যৌবনা হবে; কখনো বৃদ্ধ হবে না।

www.amarboi.org

عَنِ النَّبِيِّ (صلعم) اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يُنَادِىْ اِنَّ لَكُمْ تَصِحُّوْا فَلاَ يَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبَاسُوْا اَبَدًا. (مسلم، ترمذى)

"যখন বেহেশতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন ঘোষণা করা হবে ঃ 'হে জান্নাতীগণ!' এখন আর তোমরা কোন দিন অসুস্থ হবে না। সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোনদিন আর তোমাদের মৃত্যু হবে না; অনন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নি'আমত ভোগ করবে; কোন দিন তা শেষ হবে না। কখনো দুঃখ-কষ্টে, ক্ষুধা-অনাহারে থাকবে না।" (মুসলিম, তিরমিযী)

শিক্ষা ঃ

১. আল্লাহ তাঁর সালেহ বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন।

২. যাতে আল্লাহ চক্ষু শীতলকারী পরম নি'আমত গুপ্ত রেখেছেন।

৩. যা কোন চোখ কখনো দেখেনি।

৪. যা কোন কান কখনো শুনেনি ।

৫. যা কোন মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি।

৬. সালেহ বান্দাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করা হবে।

৭. সালেহ বান্দা হওয়ার জন্য আমাদের ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-১৪

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا (بخارى، مسلم)

অর্থ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। বলা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল! তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে উনসত্তর অংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ نَارٌ ঃ আগুন। جُزْءٌ ঃ অংশ। سَبْعِيْنَ ঃ সত্তর। جَهَنَّمَ ঃ জাহান্নাম (দোযখ)। فُضِّلَتْ ঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে। تِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ ঃ উনসত্তর।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ার আগুন শাস্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহর বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে মানুষ নিজেদের উপর নিজেরাই যুল্ম করেছে। আর এ কারণেই পরকালে অপরাধীদের কঠিনতর শাস্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি করে উত্তপ্ত করা হয়েছে। যা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী। ফলে তা নিবিড় ঘন কালো অন্ধকারে পরিণত হয়ে আছে। সে আগুনেই অনন্তকাল ধরে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. (ترمذى)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর ধরে জ্বালিয়ে রাখা হয়, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তাকে আরো এক হাজার বছর জ্বালিয়ে রাখা হয়, যার ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর উক্ত আগুন কালো বর্ণ ধারণ করে। ফলে বর্তমানে তা ঘন কালো অন্ধকারে পরিণত হয়ে আছে। (তিরমিযী)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ

সহীহ্ আল-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম। এর পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

জাহান্নাম বা দোযখের স্তর ঃ পরকালে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা সাতটি স্তরে জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ.

"শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নাম হলো প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিবাসী নির্দিষ্ট রয়েছে।" (সূরা হিজর ঃ ৪৩-৪৪)

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম

১. জাহীম;

২. জাহান্নাম;

www.amarboi.org

৩. সায়ীর;

৪. সাকার;

৫. লাজা;

৬. হুতামা;

৭. হাবিয়া।

জাহান্নামের পরিবেশ ঃ জাহান্নামের পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক, ভয়াবহ, বিভীষিকাময় ও লোমহর্ষক। যার বর্ণনা শুনা মাত্রই প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির গা শিউরে উঠে। এ পরিবেশ অভাবনীয় ও অকল্পনীয়। দোযখের আগুন পৃথিবীর আগুন অপেক্ষা উনসত্তর গুন অধিক তাপযুক্ত। জাহান্নামের স্তরগুলো যত নিচের দিকে যাবে শাস্তির মাত্রা ততই অধিক হবে। প্রত্যেক স্তরের আযাব বিভিন্ন ধরনের। জাহান্নামে জামহারির নামে একটি স্থান আছে যেখানে অত্যধিক শীত থাকবে। দোযখের মধ্যে বিষ, পুঁজ ও কর্দমের একটি কূপ আছে তার নাম ত্বীনাতুল খাবাল। সেই কূপটির পাড়ে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ উঁচু "সাউদ" নামে একটি পাহাড় আছে। কাফেরদেরকে তার চূড়া থেকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে। এমন গরম পানি পান করতে দেয়া হবে যার তেজে মুখ, ঠোঁট ও পাকস্থলী জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। জাহান্নামে মৃত্যু আসবে না এবং জাহান্নামীদের শাস্তি সামান্যও লাঘব করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيٰى.

"সেখানে তারা মরবেও না বাঁচবেও না।" (সূরা আল-আ'লা ঃ ১৩)

لاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ.

"তাদের থেকে শাস্তির কিছু মাত্র লাঘব করা হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৬)

জাহান্নামে কম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি ঃ জাহান্নামে কম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তির অবস্থা কিরূপ হবে নিম্নের হাদীসের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হল ঃ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ

www.amarboi.org

النَّارِ عَذَابًا رَّجُلٌ فِيْ اَخْمَصَيْ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ. (بخاری، مسلم)

"হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে কম শাস্তি দেয়া হবে, (তার অবস্থা হবে) তার দু'পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার (জুতা) রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোন চুলার উপর যেমনিভাবে ডেকচি ফুটতে থাকে, তেমনিভাবে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।" (বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নামের শাস্তি ঃ জাহান্নামে মহান আল্লাহ পাপীদেরকে এমন কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি দেবেন যা কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। জাহান্নামীদের খাদ্য, পানীয়, বসবাসের স্থান ও পোশাক-পরিচ্ছদসহ সকল কিছুতেই থাকবে কঠোর শাস্তির ছাপ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. জাহান্নামীদের খাদ্য ঃ জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি হবে খাদ্যাভাব। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে যখন তারা খাবার চাবে তখন তাদেরকে কণ্টক বিশিষ্ট এমন তিক্ত খাবার পরিবেশন করা হবে, যার সামান্যতম অংশ এ পৃথিবীর সকল খাদ্য ও পানীয়কে তিক্ততায় পূর্ণ করে দিতে সক্ষম। যার নামদরী (পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ) ও জাক্কুম।

২. জাহান্নামীদের পানীয় ঃ জাহান্নামীদের পানীয় হিসেবে দেয়া হবে "গিসলীন" ও "গাস্‌সাক" নামীয় ক্ষতঝরা রক্ত ও পুঁজ এবং গলিত ধাতুর ন্যায় ফুটন্ত পানি। যা পান করার পরে নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ.

"তাদেরকে হামিম বা ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যাতে নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

www.amarboi.org

৩. লোহার বেড়ী ঃ পৃথিবীর জেলখানাগুলোতে অপরাধীকে যেভাবে কয়েদখানায় বিরাট শিকল-বেড়ী পরিয়ে বেঁধে রাখা হয়। জাহান্নামীদেরকেও সেভাবে গলায় ও হাতে বেড়ী পরানো হবে যাতে তারা নড়া-চড়া করতে না পারে।

৪. পোশাক-পরিচ্ছেদ ঃ জাহান্নামীদের গায়ে নিকৃষ্ট ধরনের অতি গন্ধময় পোশাক থাকবে যা এতই ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত যে, তার একটিও পৃথিবীতে থাকলে পৃথিবীর বাতাস দূষিত হয়ে পড়ত। এছাড়াও জাহান্নামীদেরকে আগুনের ন্যায় কঠিন উত্তপ্ত তাম্র নির্মিত পোশাক পরিধান করানো হবে।

৫. জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু ঃ জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু অপরাধীদেরকে দংশন করবে। এদের আকৃতি বড় আকারের উটের ন্যায়। একবার দংশন করলে তার যন্ত্রণা চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) اِنَّ فِىْ النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِىْ النَّارِ عَقَارِبُ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا. (احمد)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "জাহান্নামে এমন সাপ রয়েছে যেগুলো বড় ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায়। সে সাপগুলো এতই বিষাক্ত ও ভয়ংকর যে, যদি সেগুলো একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে কাঠ বহনকারী খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু আছে। সেগুলো যদি একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়া থাকবে।" (আহমদ)

৬. মানসিক শাস্তি ঃ বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ও কঠিন শাস্তি ছাড়াও জাহান্নামীদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের মাধ্যমে মানসিক শাস্তি দেয়া হবে। কুরআনের বাণী ঃ

ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ.

www.amarboi.org

"আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।" (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২০)

শিক্ষা

১. জাহান্নামের শাস্তি অধিক ভয়াবহ।

২. দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনের তাপ উনসত্তর গুন বেশী।

৩. প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য।

৪. জাহান্নামের আগুন থেকে সলকেই বাঁচার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ।

৫. ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণই জাহান্নাম থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

www.amarboi.org

দারস-১৫

কবীরা গুনাহ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (متفق عليه)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ হতে দূরে থাকবে। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (সা) ধ্বংসকারী সেই সাতটি কাজগুলো কি ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (২) যাদু-টোনা করা (৩) আইনের বিধান ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) (অন্যায়ভাবে) ইয়াতিমের মাল-সম্পদ ভোগ-ভক্ষণ করা (৬) জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) ঈমানদার নির্দোষ সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত ধ্বংসকারী বিষয়গুলো শরীআতের বিধান ব্যতীত সামাজিক দৃষ্টিতেও জঘন্য অপরাধ। কোন বিবেকবান ঈমানদার ব্যক্তি এ হীন কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কেননা, এ সকল কাজে একদিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অপর দিকে এগুলো সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী। তাই নবী করীম (সা) এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সমাজে বাস্তবে এ সকল কাজের প্রচলন বহুলভাবে বিদ্যমান। তাই

www.amarboi.org

আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উল্লেখিত কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কোন অবস্থাতেই যেন আমাদের দ্বারা এ সকল কাজ সংঘটিত না হয়, তার প্রতি আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন আমাদের সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে অন্যদিকে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

"যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।" (সূরা আন্-নাজম ঃ ৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ، اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তাদের প্রত্যেককে তাদের কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। তারা যা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা হূদ ঃ ১১১)

اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪০)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"যারা নেক আমল করে তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার এবং আরো অধিক। কালিমা ও গ্লানি তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই

www.amarboi.org

জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৬)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

"যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ করবে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।" (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৭)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

"যারা ছোট খাটো দোষ-ত্রুটি ব্যতীত গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার প্রভু উদার ক্ষমাশীল।" (সূরা আন-নাজম ঃ ৩২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎ বান্দাদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা সাধারণতঃ কবীরা তথা বড় বড় গুনাহ্ এবং অশ্লীল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা ঃ كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল كَبَائِرُ যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বড় বা বৃহৎ।

www.amarboi.org

পারিভাষিক অর্থ ঃ প্রতিটি গুনাহ্ তার চেয়ে বড়টির তুলনায় 'সগীরা' এবং ছোটটির তুলনায় 'কবীরা'। এ সম্পর্কে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। اَلْكَبَائِرُ مَا وَعَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ صَرْحَةً অর্থাৎ কবীরা গুনাহ ঐ সকল পাপকে বলে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে দোযখের ধমকি দিয়েছেন এবং যেসব বিষয় আল্লাহ ও রাসূল (সা) কর্তৃক হারাম হওয়ার অকাট্য দলীল পাওয়া যায় সেগুলো কবীরা গুনাহ্। আর তওবা ব্যতীত তা মাফ হয় না।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ঃ كُلُّ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ فَهِيَ كَبِيْرَةٌ অর্থাৎ যে সকল কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা-ই কবীরা গুনাহ্।

২. ইমাম রাযীর মতে ঃ اَلْكَبَائِرُ هِيَ الَّتِيْ مِقْدَارُهَا عَظِيْمٌ অর্থাৎ যে অপরাধে শাস্তির পরিমাণ বেশী তা-ই কবীরা গুনাহ্।

৩. কারো কারো মতে ঃ اَلْكَبَائِرُ هِيَ الَّتِى يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ অর্থাৎ যে কাজ করলে হুদুদ বা শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি অনিবার্য হয় তা-ই কবীরা গুনাহ্।

৪. কুরআনে যে সকল কাজ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা করা কবীরা গুনাহ্।

৫. যে সকল অপরাধের ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন।

৬. যেসব অপরাধের জন্য আল্লাহ লোকদেরকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭. আল্লাহ যে বিষয়গুলোকে মানার এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো না মানা, না করা।

৮. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ঃ যে সকল গুনাহের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেগুলোই কবীরা গুনাহ্।

গুনাহের অন্যান্য প্রকার

ফাওয়াহিশ (فَوَاحِشَ) ঃ ফাহিশা (فَاحِشَةٌ) শব্দের বহুবচন হচ্ছে ফাওয়াহিশ। এর অর্থ কদর্য, অশালীন ও নির্লজ্জ কাজ। যা স্বভাবতই

www.amarboi.org

নোংরা ও কুৎসিত। যেমন– ব্যভিচার, মদ্য পান, উলঙ্গপনা ইত্যাদি। **লামাম (لمم)** ঃ এর অর্থ সগীরা বা ছোটখাট গুনাহ। (لمم) দ্বারা ঐ সকল গুনাহকে বুঝায় যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর তওবা দ্বারা তা চিরতরে মুছে যায়।

কুরআনে বর্ণিত গুনাহ সাধারণতঃ দু'প্রকার। যথা-

১. **কবীরা বা বড় গুনাহ;**

২. **সগীরা বা ছোট গুনাহ।**

এ দু'প্রকার গুনাহ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ.

"তাদের প্রতিটি কৃতকর্ম আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিটি সগীরা এবং কবীরাই করা আছে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-কামার ঃ ৫২-৫৩)

সগীরা গুনাহ কখনো কখনো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। এটা দু'অবস্থায় হয়।

১. সগীরা গুনাহ বার বার করলে কবীরা গুনাহের আকার ধারণ করে।

২. সগীরা গুনাহ তুচ্ছ জ্ঞান করে করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

সগীরা গুনাহ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. (مسند احمد)

"তোমরা সেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, যেগুলোকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হালকা গুনাহ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংস করে দেয়।" (মুসনাদে আহমদ)

কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا.

www.amarboi.org

"যে গুনাহগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেব এবং মহাসম্মানিত স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩১)

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ.

"যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হলেও ক্ষমা করে।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৭)

কবীরা গুনাহের ধরন তিনটি ঃ (১) যুল্‌ম (২) ফিসক ও মা'সিয়াত (৩) ফুজূর।

এ তিনটি কারণে কোন কাজ কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ ঃ

এক. কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, মাতা-পিতার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী কবীরা গুনাহ হবে। এ কারণেই গুনাহকে যুল্‌মও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে যুল্‌ম বলা হয়েছে।

দুই. আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবেলায় আত্মম্ভরিতা করা। এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে-বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানী যে পরিমাণ নির্লজ্জতা অহমিকা দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির পরিপন্থী মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গুনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গুনাহের জন্য ফিসক ও মা'সিয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন. যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার উপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক

www.amarboi.org

যতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যতো বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যতো বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গুনাহ্ ততো বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলতঃ একটি বড় গুনাহ্। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গুনাহের দিক থেকে একটি অন্যটির চেয়ে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গুনাহ্। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দূষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। অন্য কোন স্থানে যিনা করার চেয়ে মসজিদে যিনা করা কঠিন গুনাহ্। উপরে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে এ দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গুনাহ হবার দিক দিয়ে পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যতো বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যতো বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করার যতো বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা ততো বেশী বড় গুনাহ্। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গুনাহের জন্য ফুজুরের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। (তাফহীমুল কুরআন সূরা নিসা টীকা ঃ ৫৩)

কবীরা গুনাহ্ কতটি?

কবীরা গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কবীরা গুনাহের কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে আমরা মনে করি, আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যে কোন কাজ করা হোক না কেন, বান্দার জন্য উহা কবীরা গুনাহ্। যেমন শিরক ও কুফরী করা ইত্যাদি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা এর সংখ্যা ও সংজ্ঞা গোপন রেখেছেন। রাসূল (সা)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন ঃ কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস

www.amarboi.org

করল, এরপর কোনটি? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার সাথে খাওয়ায় ভাগ বসাবে এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এরই সমর্থনে আল্লাহ কুরআনে এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন আইনের বিধান ব্যতীত তাকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।" (বুখারী ও মুসলিম)

কবীরা গুনাহের সংখ্যা ঃ কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে কবীরা গুনাহের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। কেননা কবীরা ও সগীরা দু'টিই আপেক্ষিক বিষয়। এজন্য প্রত্যেকটি গুনাহই তার ছোটটির তুলনায় কবীরা এবং তার বড়টির তুলনায় সগীরা। তাই এর সংখ্যার দিক দিয়েও মতভেদ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা প্রায় ৭০০টি।

ইমাম শামসুদ্দীন আয্‌যাহাবী (র) তাঁর রচিত কিতাবুল কাবায়ের গ্রন্থে ৭০টি কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন। 'গুনাহ তাওবা ক্ষমা' নামক বইয়ের লেখক আমাদের সমাজে প্রচলিত ১৩৩টি কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা– (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা; (২) মানুষ হত্যা করা; (৩) পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; (৪) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; (৭) যিনা করা।

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত কবীরা গুনাহ ৮টি। যথা– তিনি বলেন (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা; (২) মানুষ হত্যা করা; (৩) পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; (৪) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; (৫) ইয়াতীমের

www.amarboi.org

সম্পদ আত্মসাৎ করা; (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; (৭) যিনা করা; (৮) সুদ খাওয়া।

৩. হযরত আলী (রা)-এর মতে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। যথা– (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা; (২) মানুষ হত্যা করা; (৩) পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; (৪) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; (৭) যিনা করা; (৮) সুদ খাওয়া; (৯) চুরি করা; (১০) মদ পান করা।

৪. কারো কারো মতে এর সংখ্যা ১৮টি। যথা– (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা; (২) মানুষ হত্যা করা; (৩) পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; (৪) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; (৭) ঘুষ লওয়া; (৮) সুদ খাওয়া; (৯) চুরি করা; (১০.) মদ পান করা; (১১) যিনা করা; (১২) সমকামিতা; (১৩) যাদু করা; (১৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া; (১৫) মিথ্যা কসম খাওয়া; (১৬) গীবত করা; (১৭) ওজনে কম দেয়া; (১৮) হেরেম শরীফে কোন প্রকার গুনাহ করা।

৫. কারো কারে মতে এর সংখ্যা ২০টি। যথা– (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা; (২) যিনা করা; (৩) সমকামিতা; পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; (৪) চুরি করা; (৫) মাদক দ্রব্য পান করা; (৬) শুকরের গোশত খাওয়া; (৭) অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভোগ করা; (৮) যুল্‌ম করা; (৯) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; (১০) সুদ খাওয়া; (১১) মিথ্যা কসম খাওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া; (১২) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; (১৩) ঘুষ লওয়া; (১৪) মাপে-ওজনে কম দেয়া; (১৫) কোন সাহাবীকে মন্দ বলা; (১৬) রাসূল (সা)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা; (১৭) আল্লাহর শাস্তি হতে নির্ভয় হওয়া; (১৮) যাদু বা বান-টোনা করা; (১৯) গণক ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা; (২০) হেরেম শরীফে কোন প্রকার গুনাহ করা।

www.amarboi.org

কবীরা গুনাহ্কারীর বিধান ঃ কবীরা গুনাহের জন্য তাওবা করা জরুরী। সগীরা গুনাহ্ নেক কাজের দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হবে না। মু'তাযিলাগণ বলেন ঃ মু'মিন কবীরা গুনাহ্ করলে তার ঈমান থাকে না এবং কাফেরও হয় না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী এক অবস্থায় থাকে। খারেজীদের মত হচ্ছে ঃ কবীরা গুনাহ্ করলে সে কাফের হয়ে যায়। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতগণ বলেন ঃ সে কাফের হবে না বরং তাকে বলা হবে 'মু'মিনে ফাসেক'।

শিক্ষা

আমাদের সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে দূরে থাকা কর্তব্য–

১. আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

২. যাদু-টোনা করা যাবে না।

৩. আইনের বিধান ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা যাবে না।

৪. সুদ খাওয়া যাবে না।

৫. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল সম্পদ ভোগ করা যাবে না।

৬. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা যাবে না।

৭. ঈমানদার নির্দোষ সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া যাবে না।

আমাদের সমাজ থেকে কবীরা গুনাহের প্রচলন বন্ধ করতে সুসংগঠিত হতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-১৬

তাওবা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَأَ خَطْيَـةً نُكِتَـتْ فِـىْ قَلْبِـهٖ نُكْتَـةٌ فَـاِنْ هُـوَ نَـزَعَ وَاسْـتَغْفَرَ صُقِلَتْ، فَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوْا قَلْبَهٗ فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلاًّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِـهِمْ مَّـا كَـانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

(ترمذى، نسائى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি সেই গুনাহ্ ত্যাগ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে ঐ দাগ মুছে ফেলা হয়। কিন্তু সে যদি গুনাহ্ করতেই থাকে, তাহলে ঐ দাগ বাড়তে থাকে, এমনকি তা তার সমস্ত অন্তর ছেয়ে ফেলে। এ অবস্থার নাম হলো "রান" মরিচা যা আল্লাহ্ (নিজের কিতাবে) উল্লেখ করেছেন ঃ "কক্ষণো নয়, বরং এদের মনে এদের বদ আমলের কারণে মরিচা ধরেছে।"* (তিরমিযী, নাসায়ী)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। قَالَ ঃ তিনি বলেন। اِنَّ الْعَبْدَ ঃ নিশ্চয়ই বান্দা। اِذَا اَخْطَأَ خَطْيَةً ঃ যখন কোন গুনাহ করে। نُكِتَـتْ ঃ দাগ পড়ে যায়। فِىْ قَلْبِهٖ ঃ তার অন্তরে। نُكْتَةٌ ঃ কালো

---

* (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ১৪)

www.amarboi.org

দাগ। فَاِنْ ঃ যদি। هُوَ ঃ সে। نَزَعَ ঃ পরিত্যাগ করে। وَاسْتَغْفَرَ ঃ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। صُقِلَتْ ঃ মুছে ফেলা হয়। عَادَ ঃ করতেই থাকে। زِيْدَ ঃ বাড়তেই থাকে। فِيْـهَا ঃ তার মধ্যে। حَتّٰى ঃ এমনকি। تَعْلُوْا ঃ ছেয়ে ফেলে। قَلْبَهٗ ঃ তার অন্তর। فَذَالِكَ ঃ এই অবস্থা। الرَّانُ ঃ "রান" মরিচা বা জং। الَّـذِىْ ঃ যা। ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ঃ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। كَلاَّ ঃ কক্ষনো নয়। بَـلْ ঃ বরং। عَلٰى ঃ উপর। مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ঃ যা তারা অর্জন করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ পাপ করলে মানুষের অন্তরে দাগ পড়তে থাকে। এর ফলে অন্তরে সৎকাজের অনুভূতি চাপা পড়ে যেতে থাকে এবং পাপের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। কিন্তু পাপ করে ফেলার সাথে সাথে যদি বান্দা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে নিজকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে অন্তরের কালো দাগ দূর হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰۤئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"কিন্তু যারা তাওবা করে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিলো তা প্রকাশ করে তাদেরকে আমি মাফ করে দেই, প্রকৃতপক্ষে আমি তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬০)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْـنَ اِذَا فَعَلُـوْا فَاحِشَـةً اَوْ ظَلَمُـوْۤا اَنْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوْا اللّٰهَ فَاسْـتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰـى مَا فَعَلُـوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ. اُولٰۤئِـكَ جَزَاۤؤُهُـمْ مَّغْفِـرَةٌ مِّـنْ رَّبِّـهِمْ وَجَنّٰـتٌ تَجْـرِىْ مِـنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

"যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোন গুনাহের কাজ

www.amarboi.org

করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসলে তারা সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে নিজেদের গুনাহ খাতার জন্য মাফ চায়। কারণ আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ মাফ করতে পারেন? এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগিচায় তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান! (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫ ও ১৩৬)

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মানুষের অন্তরেও জং ধরে যেমন করে তামায় জং ধরে। আর অন্তরের জং দূর করে ইস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যমে অন্তরের জং দূর হয়। (বায়হাকী)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থের পরিচিতি ৫নং দারসে দেখুন। এখানে নাসায়ী শরীফের পরিচিতি পেশ করা হলো।

সুনানে নাসায়ী

সুনানে নাসায়ী ছয়খানা প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম সহীহ হাদীস গ্রন্থ। এটি ইমাম নাসায়ী (র) সংকলন করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বাহর ইবনে মান্নান ইবনে দীনার আন-নাসায়ী। খোরাসানের অন্তর্গত 'নাসা' নামক স্থানে ২১৫ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। (ইবনে কাসীর ১১ খণ্ড ৩২ পৃঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২য় খণ্ড ঃ ১৫ পৃঃ)

তিনি ১৫ বছর বয়সে দেশ-বিদেশে সফর করে হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি মিসরে গিয়ে অনেক দিন অবস্থান করেন এবং কয়েকখানি কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি চারজন প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীসের অন্যতম। সুনানে নাসায়ীর প্রথমে তিনি 'সুনানুল কুবরা' নামে একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সংকলনে সহীহ ও গায়রে সহীহ উভয় প্রকারের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরে তিনি যাচাই বাছাই

www.amarboi.org

করে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসের একটি সংকলন তৈরী করেন। এর নাম দেন 'আসসুনানুস সুগরা'। এর অপর নাম হলো, 'আল মুজতাবা' বা সঞ্চয়িতা। সুনানে নাসায়ী দ্বারা 'আল মুজতাবা' কিতাবকেই বুঝানো হয়। এ হাদীস গ্রন্থে ৪৪৮২টি হাদীস স্থান পেয়েছে। হাদীসগুলোকে ১৫টি শিরোনামে এবং ১৭৪৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এ মহামনীষী ৩০৩ হিজরীতে ৮৯ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায)

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

তাওবার অর্থ ঃ তাওবা (تَوْبَةٌ) আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অনুশোচনা, অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অনুতপ্ত হয়ে অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে জীবন-যাপন করার অঙ্গীকার করাকে তাওবা বলে।

আল-কুরআনে তাওবা শব্দের ব্যবহার ঃ আল-কুরআনে (تَوْبَةٌ) তাওবা শব্দ ৭ বার, ক্রিয়া পদে ৬৩ বার, তাওব (تَوْبٌ) ১ বার, তা-ইবাত (تَائِبَاتٌ) ১ বার, তাইবুন (تَائِبُوْنَ) ১ বার, তাওয়াব (تَوَّابٌ) ১১ বার, তাওয়াবীন (تَوَّابِيْنَ) ১ বার এসেছে। (কুরআনের পরিভাষা ঃ ৬৬)

আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন ঃ আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি গুনাহ করে তাঁর কাছে তাওবা করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করবেন ও ক্ষমা করে দেবেন। পবিত্র কুরআনে বারবার আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

"অতএব তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ্ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।" (সূরা আন-নাসর ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ও তাওবাকারীদের ভালবাসেন।

www.amarboi.org

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন আরো ভালবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২২)

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

"অপরাধ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করার পর তারা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করে, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুই পাবে।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৪)

মানুষের প্রথম তাওবা ঃ শয়তানের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া (আ) পদস্খলন ঘটলে তাদের জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় নিতান্ত অনুতপ্ত হয় এবং অনুশোচনার আগুনে জ্বলে কায়মনে আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। এটাই মানুষের প্রথম তাওবা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ. فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা চাও ও যেভাবে চাও তৃপ্তিসহকারে খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না। গেলে, তোমরা যালিমদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান তাদের তা থেকে পদস্খলন ঘটালো এবং যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে বহিষ্কৃত করলো। আমি বললাম ঃ তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে

www.amarboi.org

(বেহেশ্‌ত থেকে) নেমে যাও। কিছু কালের জন্য পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস ও জীবন যাপন করতে হবে। তারপর আদম তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। তিনিতো মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৫-৩৭)

আদম ও হাওয়া (আ)-এর তাওবা ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আ) তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে যে বাণী প্রাপ্ত হলেন তা হচ্ছে ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"তাঁরা বলল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের ওপর অন্যায় করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২৩)

প্রকৃত তাওবার নিয়ম ঃ তাওবা মানে-ব্যক্তি তার কৃত পাপ কর্মের জন্য লজ্জিত-অনুতপ্ত হবে, যে অপরাধ সে করেছে বা করে আসছিল সে পথে আর পা বাড়াবে না, সে কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। খালিস্ তাওবার অনিবার্য দাবী অনুযায়ী, সে যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে-সাধ্যমত তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। আর যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সুযোগ নেই, সে ক্ষেত্রে পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং নিজের উপর সে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোন তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কারণে পাপ কর্ম ত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ-শূরা টীকা ঃ ৪৭)

তাওবার প্রকারভেদ ঃ তাওবা কয়েক প্রকার। যথা ঃ

(১) শির্‌ক মিশ্রিত তাওবা; (২) মুনাফিকী তাওবা; (৩) বেবুঝ তাওবা; (৪) মৃত্যুকালীন তাওবা; (৫) তাওবাতান্ নাসূহা।

১. শিরক মিশ্রিত তাওবা ঃ নিজের গুনাহ্-খাতা মাফ করিয়ে নেয়ার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট যেয়ে বা স্থানে যেয়ে এ আশায় তাওবা করা যাতে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। যেমন কবর বা মাযারে গিয়ে তাওবা করা।

www.amarboi.org

বিদ'আতী পীর ফকিরের নিকট গিয়ে তাওবা করাকে শিরক মিশ্রিত তাওবা বলা হয়।

৪. **মুনাফিকী তাওবা** ঃ যে তাওবার সথে আন্তরিকতার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু মুখে মুখে তাওবার শব্দ উচ্চরণ করা। মুনাফিকী তাওবার উদ্দেশ্য পাপ মুক্ত হওয়া নয়; প্রতারণা।

৩. **বেবুঝ তাওবা** ঃ যে তাওবা ব্যক্তি মন্ত্রের মত মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু সে তার অর্থ ও মর্ম বুঝে না এবং তাওবার দাবী অনুযায়ী পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না।

৪. **মৃত্যুকালীন তাওবা** ঃ সারা জীবন বেপরোয়াভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পর মৃত্যুর সময় যে তাওবা করা হয় তাকে মৃত্যুকালীন তাওবা বলে।

৫. **তাওবাতান্ নাসূহা** ঃ 'তাওবাতান নাসূহা' বা খাঁটি তাওবা হলো আন্তরিকতাপূর্ণ নিষ্কলুষ তাওবা। যা উৎসারিত হয় বান্দার অনুতপ্ত অন্তর থেকে। যার পেছনে থাকে গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ আর ক্ষমা পাওয়ার অদম্য বাসনা। তাই 'তাওবাতান নাসূহা' অর্থ হচ্ছে এমন তাওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকীর লেশমাত্র নেই।

হযরত উমার (রা) 'তাওবাতান নাসূহার' সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাওবার পরে পুনরায় গুনাহ করা তো দূরের কথা তা করার আকাঙ্খা পর্যন্ত করবে না। (ইবনে জারীর)

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাওবাতান নাসূহা করার হুকুম দিয়েছেন।

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا. عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা খালেস দিলে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আস, আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন এবং সেই জান্নাতে স্থান দেবেন, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৮)

www.amarboi.org

খাঁটি তাওবা গুনাহকে নেকে পরিণত করে ঃ যারা গুনাহ করার পর খাঁটি দিলে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের পেছনের গুনাহসমূহকে নেকে পরিণত করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গুনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭০)

"এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎ কাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন" এর দু'টি অর্থ হয়।

এক. যখন তারা তাওবা করবে তখন ইতিপূর্বে কুফরী জীবনে তারা যে সমস্ত খারাপ কাজ করতো তার জায়গায় এখন ঈমান আনুগত্যের জীবনে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা সৎকাজ করতে থাকবে। ফলে সৎকাজ তাদের অসৎকাজের জায়গা দখল করে নেবে।

দুই. তাওবার ফলে কেবল তাদের আমলনামা থেকে তারা কুফরী ও গুনাহগারের জীবনে যে সব অপরাধ করেছিল সেগুলো কেটে দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে প্রত্যেকের আমলনামায় এ নেকি লেখা হবে যে, এ হচ্ছে সেই বান্দা যে বিদ্রোহ ও নাফারমানীর পথ পরিহার করে আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। তারপর যতবারই সে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের খারাপ কাজগুলো স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং নিজের প্রভু রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা করে থাকবে ততটাই নেকি তার ভাগে লিখে দেয়া হবে। কারণ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াই একটি নেকির কাজ। এভাবে তার আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে নেবে পরবর্তীকালের নেকিসমূহ এবং কেবলমাত্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মধ্যেই তার পরিণাম সীমিত থাকবে না বরং উল্টো তাকে পুরস্কৃতও করা হবে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, টীকা ঃ ৮৭)

www.amarboi.org

তাওবা রহমতের দরজা খুলে দেয় ঃ তাওবা আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরজা খুলে দেয় এবং তাঁরই দরবারে ফিরে আসার সুযোগ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.

"যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭১)

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর দরবারেই বান্দার আসল ফিরে আসার জায়গা এবং নৈতিক দিক দিয়েও তাঁর দরবারই এমন একটি জায়গা যেদিকে তার ফিরে আসা উচিৎ। আবার ফলাফলের দিক দিয়েও তাঁর দরবারের দিকে ফিরে আসা লাভজনক। নয়তো দ্বিতীয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এসে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে অথবা পুরস্কার পেতে পারে। এছাড়া এর অর্থ এও হয় যে, সে এমন একটি দরবারের দিকে ফিরে যাচ্ছে যেখানে সত্যি ফিরে যাওয়া যেতে পারে, যেটি সর্বোত্তম দরবার, সমস্ত কল্যাণ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, যেখান থেকে লজ্জিত অপরাধীকে তাড়িয়ে দেয়া হয় না বরং ক্ষমা ও পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর অপরাধ গণনা করা হয় না বরং দেখা হয় সে তাওবা করে নিজের কতটুকু সংশোধন করে নিয়েছে এবং যেখানে বান্দা এমন প্রভুর সাক্ষাৎ পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন না বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন। (তাফহীমুল কুরআন, আল-ফুরকান ঃ ৮৮)

কাদের তাওবা কবুল হয় ঃ যারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করে না পরকালে তাদের ধ্বংস অনবার্য। তবে এ সকল লোকদের মধ্যেও যদি মুক্তির চেতনা ফিরে আসে, আর তারা খাঁটি দিলে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

"তবে যারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে-

www.amarboi.org

সালেহ করবে, আশা করা যায়, তারা সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা অল-কাসাস ঃ ৬৭) তিনি আরো বলেন ঃ

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْـنَ يَعْمَلُـوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَـةٍ ثُـمَّ يَتُوْبُـوْنَ مِـنْ قَرِيْبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"অবশ্যই তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে ফেলে এবং সত্বর তাওবা করে। এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা ঃ ১৭)

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ.

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা করো তিনি (আল্লাহ্) তা জানেন।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ২৫)

তাওবা কবুল হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তা নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ঃ

হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইস্তেগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বললেন, সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি বিষয় থাকতে হবে ঃ

১. যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হওয়া;

২. নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করেছ তা সম্পাদন করা;

৩. যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দেয়া;

৪. যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাওয়া;

৫. প্রতিজ্ঞা করা ভবিষ্যতে এ গুনাহ্ আর করবে না এবং

৬. নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গুনাহের কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করো। এত দিন পর্যন্ত আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় যেমন নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর অনুগত্যের তিক্ততায় আস্বাদন করাও। (কাশ্‌শাফ)

www.amarboi.org

তাওবা কবুল হওয়ার শর্তসমূহ ঃ তওবা কবুল হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. অনুতপ্ত হওয়া;

২. নিজেকে সংশোধন করে নেয়া;

৩. গুনাহ্ করার সাথে সাথে তাওবা করা;

৪. তাওবার সাথে সাথে দান-সাদকা করা;

৫. হকদারের হক ফেরত দেয়া।

কাদের তাওবা কবুল হয় না ঃ যে সকল লোক সারাজীবন বেপরোয়াভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করেছে এবং পাপের পর পাপ কাজ করেছে, মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হলে সে যদি তাওবা করে তবে তার তাওবা কবুল হবে না। আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى تُبْتُ الْئٰنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارًا ط اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

"তাওবার কোন ফল পাবে না ঐসব লোক, যারা মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত পাপকর্ম করেই যেতে থাকে। অবশেষে মৃত্যুকে হাজির দেখতে পেয়ে বলে ঃ 'আমি তাওবা করলাম।' আর সেসব লোকেরাও তাওবার কোন ফল পাবে না, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এসব লোকদের জন্যই আমরা তৈরী করে রেখেছি পীড়াদায়ক আযাব।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৮)

শিক্ষা

৪. কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করলে তার অন্তরে মরিচা বা জং ধরে।

৫. গুনাহ্ পরিত্যাগ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ঐ জং চলে যায়।

৬. কিন্তু সে যদি গুনাহ করতেই থাকে তাহলে ঐ জং বাড়তে থাকে।

৪. আমাদেরকে গুনাহ্ পরিত্যাগ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ।

৫. আন্তরিক তাওবাই হচ্ছে গুনাহ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

www.amarboi.org

দারস-১৭

ক্ষমা প্রার্থনা

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাওবা করি। (বুখারী)

শব্দার্থ ঃ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। قَالَ ঃ তিনি বলেন। سَمِعْتُ ঃ আমি শুনেছি। رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) ঃ রাসূল (সা)। يَقُوْلُ ঃ তিনি বলেন। وَاللّٰهِ ঃ আল্লাহর কসম! اِنِّىْ ঃ নিশ্চয়ই আমি। لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ঃ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ঃ এবং তাঁর নিকট তাওবা করি। فِى الْيَوْمِ ঃ দৈনিক। اَكْثَرَ ঃ অধিক। مِنْ ঃ হতে। سَبْعِيْنَ مَرَّةً ঃ সত্তর বারের।

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ পাক তার অপরাধকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহর রাসূল (সা) নিষ্পাপ ও অপরাধমুক্ত ছিলেন তারপরও তিনি সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

"(হে নবী) আর আপনি আপনার নিজের ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

www.amarboi.org

তাই তিনি দিনেরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাওবা না করলে রাসূলের অন্তরে পর্দা পড়ে যেত।

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِ وَإِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার অন্তরের ওপর পর্দা পড়ে যায়। তাই আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশ' বার তাওবা করি। (মুসলিম)

অপর হাদীসে একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা গণনা করে দেখেছি একই বৈঠকে রাসূল (সা) একশ' বার এ দু'আটি পড়েছেন।

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তাই আমাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, তাহলে আমাদের অপরাধকেও আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেবেন ঃ

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা নিসা ঃ ১০৬)

কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং সে প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করলে তিনি পাপমুক্ত করে দেন।

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ.

"অনুতপ্ত ক্ষমা প্রার্থনাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার পাপ নেই। (ইবনে মাজা)

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ সহীহ আল-বুখারী। হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি ১নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর পরিচিতি ৪নং দারসে দেখুন।

www.amarboi.org

১. ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নেক কাজ এবং পাপ কাজ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন। দু'ধরনের কাজের প্রবণতাই মানুষের মধ্যে শক্তিশালী। তাই মু'মিনদেরকে নিজের স্বার্থে পরকালে মুক্তির লক্ষ্যে নেক কাজ করে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হতে হবে। আর মানুষ মাত্রই ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। পাপ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

"আপনার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন। আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক পরিমাণে তাওবা গ্রহণকারী। (সূরা নাসর ঃ ৩)

হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার ওপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম করবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হিদায়াত দান করেছি, সে ব্যতীত তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার কাছে হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য আবেদন করো। আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! যাকে আমি খাদ্য দান করেছি, সে ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার কাছে খাদ্যের আবেদন করো। আমি তোমাদের খাদ্য দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি, সে ব্যতীত আর সকলেই বিবস্ত্র। অতএব তোমরা আমার কাছে বস্ত্রের জন্য আবেদন করো। আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহ্ করে থাক। আমি সকল গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। (মুসলিম)

২. আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ঃ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

اِنَّهٗ لَايَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত হতে কাফির ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلاَّ الضَّآلُّوْنَ.

"নিজের খোদার রহমত হতে তো কেবল মাত্র গোমরাহ লোকেরাই নিরাশ হয়ে যায়। (সূরা আল-হিজর ঃ ৫৬)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. وَاَنِيْبُوْآ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ. وَاتَّبِعُوْآ اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ لا اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ لا اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ لا اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"হে নবী (সা)! আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন ঃ হে আমার বান্দারা, যারা সীমালংঘন করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, তিনিতো ক্ষমাশীল দয়াময়। তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তাঁর আযাব তোমাদের গ্রাস করার আগেই। কারণ, তখন তোমাদের সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর অবতীর্ণ সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করো তোমাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ তাঁর আযাব তোমাদের গ্রাস করার পূর্বেই। যাতে করে তখন কাউকেও একথা বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি

www.amarboi.org

যে অবহেলা প্রদর্শন করেছি তার জন্য আফসোস, হায়! আমিতো বিদ্রূপকারীদের দলে ছিলাম। অথবা কারো যেন বলতে না হয় ঃ আল্লাহ আমাকে হেদায়াত করলে আমি অবশ্য মুত্তাকীদের দলে থাকতাম। অথবা শাস্তির দৃশ্য দেখে কারো যেন বলতে না হয় ঃ হায়! একবার যদি আমি দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম তবে অবশ্য নেককার হয়ে আসতাম। (সূরা আয-যুমার ঃ ৫৩-৫৮)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"যদি কেউ কোন অপরাধ করে কিংবা নিজের ওপর যুলুম করে বসে এবং পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী অনুগ্রহশীল পাবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১১০)

৩. শাস্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় ঃ পাপ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَاكَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

"আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা গুনাহ মাফ চাইতে থাকে, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন; প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করেনি। (আবু দাউদ)

৪. আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফের কেউই নেই ঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কেউই নেই যে ক্ষমা করতে পারে। গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে। মনে মনে ইরাদা করবে পুনরায় সে পাপ কাজ আর করবে না এবং এ প্রার্থনায় আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"(মুত্তাকী তারাই) যারা কখনো যদি কোন খারাপ কাজ করে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন কে আছে ? আর এসব লোক জেনে শুনে খারাপ কাজ বার বার করে না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি– আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকট যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি।" তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। এমনকি সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ করলেও। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকিম)

৫. আল্লাহ্ সব গুনাহ্ মাফ করতে পারেন ঃ যতো বেশী ও যতো বড় গুনাহই হোক না কেন আল্লাহ্ তা মাফ করে দিতে পারেন। তাই একমাত্র আল্লাহর কাছেই গুনাহের জন্য মাফ চাইতে হবে।

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট দু'আ করতে থাকবে এবং আমার নিকট প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার গুনাহ্ মাফ করতে থাকবো। তা তোমার গুনাহের পরিমাণ যতো বেশী ও যতো বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন ভ্রূক্ষেপ করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তুমি যদি আমার নিকট মাফ চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়াই করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার নিকট পৃথিবী

www.amarboi.org

চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়াই করবো না।' হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার নিকট পৃথিবী পরিমাণ গুনাহসহ হাজির হও আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো তবে আমিও ঠিক পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট এগিয়ে আসবো। (তিরমিযী)

৬. খোদভীরুগণই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ঃ খোদাভীরু লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নিজেদেরে নেক কাজের জন্যে গর্ব করে না। তারা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য সবসময় চিন্তিত থাকে এবং আল্লাহর কাছে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়ে, আল্লাহর কাছে হিসাব দেবার ভয়ে, আল্লাহর আযাবের ভয়ে এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এ কারণেই তিনি তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا.

"আল্লাহকে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করে দেন আর বড় করে দেন তার পুরস্কার।" (সূরা আত-তালাক ঃ ৫)

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

"যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫)

৭. দিনরাত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ঃ কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে মুক্ত নন। সকলেরই কম-বেশী গুনাহ হয়ে থাকে। আর কেউই আল্লাহর রহমত ছাড়া নিজের আমল দ্বারা মুক্তির আশা করতে পারে না। তাই প্রকৃত মুক্তিকামী মানুষ দিন রাত মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত আছে ঃ

يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تَخْطَئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

www.amarboi.org

فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرُ لَكُمْ.

"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গুনাহ করে চলছো, আর আমি তামাম গুনাহ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তেমাদর ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

"বান্দা যখন তাঁর (প্রভুর কাছে) অপরাধ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّائِبُوْنَ.

"প্রতিটি আদম সন্তানই গুনাহগার ও অপরাধী। আর সর্বোত্তম অপরাধী হলো তারা, যারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৮. জ্ঞানীগণই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থিনা করে ঃ মূলত আল্লাহকে ভয় করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণই আল্লাহর গুণ এবং শক্তি সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত। তাই তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল। (সূরা আল-ফাতির ঃ ২৮)

৯. ক্ষমার জন্য চাই রীতির পরিবর্তন ঃ ক্ষমা পাওয়ার জন্য জীবন-যাপনে পরিবর্তন আনতে হবে। তাওবা কবুল ও ক্ষমা পাওয়ার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে।

১. নিজের জীবনকে আল্লাহর হুকুমের অনুগত করতে হবে।

২. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

৩. আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

www.amarboi.org

৫. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৬. নিজে সঠিক পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১০. রাসূলের (সা) ক্ষমা প্রার্থনা পদ্ধতি ঃ রাসূল (সা) যেভাবে নিজে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলতেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا.

"সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার আমলনামায় বেশী বেশী 'ইস্তিগফার' পাওয়া যাবে।" (ইবনে মাজা, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) প্রায়ই এ প্রার্থনা করতেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَئُوا اسْتَغْفَرُوْا.

"হে আল্লাহ! আমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা ভালো কাজ করলে আনন্দিত হয় এবং মন্দ কাজ করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (বায়হাকী, ইবনে মাজা)

রাসূল (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে নামাযে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা দান করো এবং আমাকে রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা)-এর নিকট যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন তখন তাকে নামায শিক্ষা দিতেন এবং নামাযের মধ্যে এই প্রার্থনা

www.amarboi.org

করতে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

“হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে সঠিক পথে চালাও, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে জীবিকা দাও।” (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ আমরা গণনা করে দেখেছি, একই বৈঠকে রাসূল (সা) একশ’ বার এ দু‘আটি পড়েছেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে এ দু‘আটি পড়েছেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

“আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি। (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা

১. রাসূল (সা) দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবা করতেন।

২. পাপমুক্ত হওয়ার জন্য সকলেরই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ।

৩. আমাদেরকে নিয়মিতভাবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

www.amarboi.org

দারস-১৮

ইহ্‌তিসাব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّـهِ (صلعـم) اَلْمُسْلِمُ اَخُـوا الْمُسْلِمِ لاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَظْلِمُـهُ وَاِنَّ اَحَدَكُـمْ مِـرْآةُ اَخِيْـهِ فَـاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ. (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না, তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। তার কোনো ত্রুটি দেখলে তা যেনো দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

শব্দার্থ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। قَالَ ঃ তিনি বলেন। قَالَ رَسُوْلُ اللّـهِ (صلعـم) ঃ রাসূল (সা) বলেছেন। اَلْمُسْلِمُ ঃ একজন মুসলমান ব্যক্তি। اَخُوْا ঃ ভাই (বহু বচন)। لاَ يَخْذُلُهُ ঃ সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না। وَلاَ يَكْذِبُهُ ঃ এবং সে তার সাথে মিথ্যা বলবে না। وَلاَ يَظْلِمُهُ ঃ এবং সে তার প্রতি যুলুম করে না। وَاِنَّ ঃ এবং নিশ্চয়ই। اَحَدَكُـمْ ঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউই। مِـرْآةُ ঃ আয়নাস্বরূপ। اَخِيْـهِ ঃ তার ভাইয়ের। رَاٰى ঃ সে দেখে। اَذًى ঃ ত্রুটি। فَلْيُمِطْ ঃ অতঃপর সে যেন দূর করে দেয়। عَنْهُ ঃ তার হতে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসখানায় ইহ্‌তিসাব বা গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের দীনি সম্পর্ক। ঈমানের কারণে এ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইহা আদর্শিক সম্পর্ক।

www.amarboi.org

নিছক কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়। কাজেই অপর মুসলমান ভাইকে কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে লাঞ্ছিত করা, তার সাথে মিথ্যা কথা বলা ও তার প্রতি যুলুম করা অন্যায়। ইসলামী শরী'য়তে এটি কবীরা গুনাহ। মিথ্যা হলো বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। এটি মুনাফিকের আলামত। এটি শুধু ইসলামেই জঘন্য অপরাধ নয় বরং পৃথিবীর সকল ধর্মেই জঘন্যতম পাপ বলে ঘৃণিত। আল্লাহ বলেন ঃ "যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)

যুলুম করা অন্যায়। কোন অবস্থায়ই আল্লাহ যুলুমকে কখনই পছন্দ করেন না। মযলুম ব্যক্তির দু'আ অতিদ্রুত আল্লাহর দরবারে পৌঁছে থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ "যুলুমবাজরা তাদের যুলুমের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে।

ইসলামী আন্দোলনে এক কর্মী অপর কর্মীর নিকট আয়নাস্বরূপ। আয়নায় যেভাবে ব্যক্তির সঠিক চেহারা দেখা যায়, কোন দাগ থাকলে তাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, ঠিক তেমনিভাবে একজন কর্মীর ক্রটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা অপরজনের নিকট ফুটে উঠাই স্বাভাবিক। আয়না যেমন ব্যক্তির চেহারার দাগ তুলতে সাহায্য করে, তেমনিভাবে অপর ভাইকেও তার ক্রটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। তাহলে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ, আদর্শবান ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় বা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অপর ব্যক্তিও তার ক্রটি-বিচ্যুতি বিদূরিত করে বিশুদ্ধ মানবে পরিণত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশোধনের উদ্দেশ্যে নীরবে গঠনমূলক সমালোচনা করা জায়েয। কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য লজ্জা দেয়া, নিন্দা করা ও সমালোচনা করা সঠিক নয়।

গ্রন্থ পরিচিতি ঃ জামে আত তিরমিযী গ্রন্থের পরিচিতি ৫ নং দারসে দেখুন।

রাবী পরিচিতি ঃ আবূ হুরায়রা (রা)-এর পরিচিতি ৪১ নং দারসে দেয়া হয়েছে।

ইহ্‌তিসাব অর্থ ঃ ইহ্‌তিসাব হলো গঠনমূলক সমালোচনা। পরকালে আল্লাহর কাছে প্রত্যেক কাজের হিসাব দিতে হবে। সে হিসাবের পূর্বেই ইসলামী আন্দোলনের এক ভাই অপর ভাইকে দুনিয়ার জীবনে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরকালে হিসাবের কাজ সহজ করে দিতে পারেন। এ

www.amarboi.org

লক্ষ্যে গঠনমূলক সমালোচনা করা জায়েয আছে। ইহ্‌তিসাব সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ.

"মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির কারণে উহা উপেক্ষা করে চলছে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১)

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪)

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

"সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমারই দায়িত্ব।" (সূরা আল-গাশিয়া ঃ ২৫, ২৬)

"তাই কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের সময়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ "আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

রাসূল (সা) বলেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাকে তার দেশবাসীর প্রতি করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ সে তার সংসারের দায়িত্বশীল। এ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীলা। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রাখ তোমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এ জন্য জিজ্ঞেস করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাসাবার প্রয়োজনীয়তা

মুহাসাবা সংগঠনের প্রাণ। আদর্শিক সংগঠনের সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ থাকা অপরিহার্য। সংগঠন যখন এ প্রাণ হারিয়ে ফেলবে তখনই সে মৃত্যু পথযাত্রী হবে। কর্মীদের ব্যক্তি জীবনের ও সাংগঠনিক জীবনের দুর্বলতা দূর করতে পারলেই কেবল সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ কাজ করতে

www.amarboi.org

হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

মুহাসাবা করার পদ্ধতি ঃ ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অন্য কর্মীর আয়নাস্বরূপ। আয়না নীরবে ব্যক্তির সঠিক চেহারাটা ফুটিয়ে তোলে। এ নিয়ে শোরগোল বা চিৎকার করে বেড়ায় না। সামনে থেকে সরে গেলে সেটা ধরে রাখে না। তাছাড়া আয়না নিখুঁত ছবিটি হুবহু তুলে ধরে, কমবেশী করে না। চেহারায় কোন দাগ থাকলে তা মুছে ফেলার পর আয়না সেটাকে জিইয়ে রাখে না। এভাবে এক কর্মী আর একজন কর্মীর ভুল নীরবে তুলে ধরতে পারেন। এদিক সেদিক বলাবলি না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলবেন। বলবেন আন্তরিকতার সাথে তার কল্যাণকামী হয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার পর কোন কর্মীর দুর্বলতা যদি দূর না হয় তাহলে উর্ধ্বতন কোন ফোরামে বা যে কোন সাংগঠনিক বৈঠকে খুবই মোলায়েম ভাষায় এবং বাড়াবাড়ি না করে যথানিয়মে পেশ করবেন। অবশ্য পেশ করার পূর্বে দায়িত্বশীলের সাথে আলাপ করে নিবেন। যিনি পেশ করবেন, তিনি কাউকে হেয় করার জন্য পেশ করবেন না। যার ব্যাপারে পেশ করা হবে তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিবেন এবং সবার দু'আ কামনা করবেন। অথবা অভিযোগ যথার্থ না হলে তিনি সুন্দরভাবে তার বক্তব্য পেশ করবেন। তবে উভয়কে বৈঠকের রায় মেনে নিতে হবে। এভাবে নেহায়েত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে পরস্পর দুর্বলতা দূর করার প্রচেষ্টার নাম মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনা। সংগঠনের সুস্থতার জন্য এ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংগঠনের সুস্থতা ও সজীবতা মুহাসাবার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। (সংগঠন পদ্ধতি পৃ. ৫৬)

শিক্ষা

১। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

২। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করবে না, তার সাথে মিথ্যা বলবে না এবং তার প্রতি যুলুম করবে না।

৩। প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ।

৪। কেউ কারো কোনো ত্রুটি দেখলে তা দূর করে দেয়ার চেষ্টা করবে।

www.amarboi.org

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার । বাংলাবাজার । কাঁটাবন
E-mail: ahsan_publication@yahoo.com
Ahsan Publication
ISBN 984-32-3627-0